সিংহবাহিনী

সমরেশ মজুমদার

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

সিংহবাহিনী

॥ ১॥

ভৈরবীমায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাঠের মধ্যে এসে দাঁড়াল গোপা। এখন হাওয়া বইছে। গাছেরা দুলছে। চারপাশে সবুজেরা আরও ঘন হয়েছে। গোপা তাকাল অন্ধকারের দিকে। চারিদিকে শুধু শান্তি আর শান্তি।

গোপা চোখ বন্ধ করল। তার সমস্ত শরীর এখনও ঝিমঝিম করছে। একি শুনল আজ? জীবনে কখনও কোনও গুরুদেবের কাছে যায়নি। সে যেমন নাস্তিক নয় আবার আস্তিকও যে খুব তা জোর দিয়ে বলা যায় না। একটা অভ্যেসের বশে দৈনন্দিন জীবনে ঈশ্বরকে মেনে নিয়েছে। ভৈরবী মা-র কথাগুলো আবার মনে করার চেষ্টা করল।

'তুমি সাধারণ নও। তোমার মধ্যে মহাশক্তির আশীর্বাদ আছে। তুমি পৃথিবীতে এসেছ মাথা নিচু করে সব কিছু মেনে নিতে নয়। নিজেকে নষ্ট কোরো না। মনে রেখো, তুমি মহাশক্তির একটি অংশ।' বলার সময় ভৈরবীর কণ্ঠস্বর অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। যেন আকাশবাণী হচ্ছে এমন মনে হয়েছিল। এখনও তার প্রতিক্রিয়া শরীরে এবং মনে।

জোর করে হাসল গোপা। ধুৎ! তা কি হয়! সে একজন সাধারণ মেয়ে। আর পাঁচটা বাঙালি মেয়ের মতই সাধারণ। ভৈরবী মা বলার জন্যে ওসব বলেছেন। এসব নিয়ে ভাবার কোনও মানেই হয় না।

হঠাৎ চোখে পড়ল ওপাশ থেকে একটা রাতপাখি উড়ে এসে বসল ঘাসের ওপর। এখন রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে মশারির মত আলো পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে। চাঁদ ওঠেনি কিন্তু আকাশে অপূর্ব আলো। পাখিটা গর্বিত ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তখনই দ্বিতীয়টা এল। হেঁটে গিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট লাগাতেই অদ্ভুত গলায় ডেকে উঠল প্রথম পাখিটা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওদের পারস্পরিক প্রেম-বিনিময় এমন পর্যায়ে চলে গেল যে লজ্জা পেয়ে গেল গোপা। চোখ সরিয়ে নিতেই মনে পড়ল পরিমলের কথা। অনেকক্ষণ হলঘর থেকে বেরিয়েছে সে। পরিমল নিশ্চয় চিন্তা করছে।

দৌড়ে চলে এল সে তাদের ঘরের দিকে। আপাতত এটাই তাদের ঠিকানা। দরজা ভেজানো ছিল। ঘরে ঢুকে গোপা দেখল একটা পত্রিকা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে পরিমল। বুকের ওপর আলগাভাবে পড়ে রয়েছে বইটা আর কেমন অসহায় ভঙ্গিতে ঘুমোচ্ছে সে। দরজা আলতো করে ভেজিয়ে খাটের কাছে চলে এল গোপা। পরিমলকে ধাক্কা দিল, 'এই শুনছ!'

পরিমল চটকা ভেঙে চোখ কুঁচকে তাকাল। গোপা অধৈর্য স্বরে বলে উঠল, 'শোনো না?'

গোপার দিকে তাকিয়ে উঠে বসল পরিমল, 'কি হল? এতক্ষণ কি করছিলে?'

'জানো, ভৈরবী মা বলেছেন আমি মহাশক্তির অংশ।' হুড়মুড়িয়ে বলে উঠল গোপা।

'কি!' চমকে ওঠে পরিমল।

'হ্যাঁ গো, তাই তো বললেন। বললেন, আমি নাকি সাধারণ নই।'

'হয়ে গেল।' পরিমলের গলায় উপহাস।

'কি হয়ে গেল?'

'খেলা শুরু হযে গেল।' পরিমল হাই তোলে।

'কি যা-তা বলছ? তোমার সবতাতেই ফাজলামি।' গোপার চোখে তখনও মাদকতা।

'ভদ্রমহিলা এক রাতেই জাদু করে ফেললেন দেখছি। স্বীকার করতেই হবে অসাধারণ সম্মোহনী বিদ্যার অধিকারী। সামলে থেকো।'

পরিমল কথা শেষ করতেই গোপা চোখ পাকাল। খাটে বসে বলল, 'তখন থেকে যা-তা বলে যাচ্ছ। কে কোথা থেকে শুনে ফেলবে তার ঠিক নেই। এখনও তোমার বন্ধুর দেখা নেই। ভুলে যেয়ো না ওই ভৈরবী মা-ই দয়া করে আমাদের থাকতে দিয়েছেন।'

'সত্যি, বিকাশটা যে এভাবে ডোবাবে ভাবতে পারিনি।'

'বাঃ, তুমি যে আজ আসবে সে কথা কি বিকাশবাবু জানতেন?'

'তা ঠিক।' পরিমল উঠে জানলার কাছে এগিয়ে গেল। বাইরে কোনও শব্দ নেই। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'বিকাশটা যে কি করে এই ভৈরবী মায়ের পাল্লায় পড়ল!'

গোপা গলা নামায়, 'আস্তে বলো। বললাম না, কেউ শুনতে পাবে।'

'শুনুক গে! বিকাশ আমার বহুদিনের বন্ধু—ওর সম্পর্কে যে কোনও কথা বলার অধিকার আমার আছে। তবে কি জানো, বরাবরই ও একটু ক্ষ্যাপাটে স্বভাবের ছিল।'

'মানে?'

পরিমল মাথা নাড়ে, 'ভাল ছাত্র ছিল। খেলাধূলায় ভাল ছিল। কিন্তু অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলত।'

গোপা হাসে, 'কি রকম?'

'আমরা সবাই যখন ভবিষ্যৎ জীবনের কথা নিয়ে আলোচনা করতাম, ও খুব বিরক্ত হত। বলত, আমরা শুধু নিজের কীসে ভাল হয়, কীভাবে ভাল থাকব, সেই ভেবেই জীবনটা কাটিয়ে দিই। কিন্তু যে দেশ যে সমাজ আমাদের এতটা বড় করে তুলতে সাহায্য করল তার প্রতি আমরা কোনরকম দায়িত্ব পালন করি না। কিন্তু আমাদের সবারই উচিত সাধ্যমত তার জন্য কিছু করা। শুধু খাব-দাব, বিয়ে করব, ছেলে-মেয়ের জন্ম দেব আর বুড়ো হয়ে মরে যাব— এই জন্যই কি জন্ম নেওয়া?'

'ও, তাই বুঝি উনি বিয়ে করেন নি?' গোপা জিজ্ঞেস করে।

'ভগবান জানেন। তবে ওর পাগলামো কি একটা? গ্র্যাজুয়েশন করে ল-এ ভর্তি হল। কিছুদিন পরে হঠাৎ ছেড়ে দিল। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ছেড়েই যদি দিবি তাহলে এত কাণ্ড করে ভর্তি হলি কেন? কি বলল জানো?— ভেবে দেখলাম ওকালতি করে হবেটা কি? সমাজের কোনও কাজে তো আসতে পারব না। কতগুলো ধান্দাবাজ লোকের পাল্লায় পড়ে সারা জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে। পয়সার জন্য ওই জঘন্য কাজ করার চেয়ে গ্রামে গিয়ে সেখানকার মানুষদের মধ্যে থেকে কিছু করা ভাল।'

'তাই উনি এখানে চলে এলেন?'

'একজাক্টলি। তারপর থেকেই তো আমার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। কি করত, কোথায় ঘুরে বেড়াত কিছু জানতাম না। আর আমার জীবনেও তখন ঘূর্ণিঝড় বইছে। অন্য কাউকে নিয়ে মাথা ঘামাবার সুযোগ ছিল না।' হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় পরিমল। কিছু যেন মনে করতে চেষ্টা করে। তারপর বলে ওঠে, 'আশ্চর্য! এতক্ষণ এসেছি, একবারও বিকাশের মাকে দেখলাম না তো? যতদূর জানতাম মাকে সঙ্গে নিয়েই ও মগরায় এসেছিল। কোথায় গেলেন মাসিমা?' পরিমল চিন্তিত ভঙ্গিতে বলে।

হঠাৎ দরজা খুলে যায়। ভৈরবী মায়ের গলা শোনা যায়, 'বেশ কিছুদিন হল তিনি গত হয়েছেন।'

ওরা দুজনেই চমকে ওঠে। পরিমল জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়। ভৈরবী মা অল্প হেসে বলেন, 'বিকাশের মায়ের কথা বলছ তো? তিনি চলে গেছেন।'

পরিমল স্খলিত গলায় বলে, 'মাসিমা... মারা গেছেন?'

হাতে ধরা দুটো থালা মাটিতে নামিয়ে রেখে ভৈরবী মা সোজা তাকালেন পরিমলের দিকে, 'মারা যাওয়া মানে হল তো সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়া। কিন্তু সত্যিই কি মৃত্যু হলে মানুষের সবকিছু শেষ হয়ে যায়? না, মৃত্যু তো জীবনের একটা ঘটনা মাত্র। অন্য অনেক ঘটনার মতই। তার এত শক্তি কোথায় যে মানুষের অনন্ত ক্ষমতাকে সে শেষ করে দেবে? তাই বলতে পারো, বিকাশের মা এই দুনিয়ায় তাঁর কাজ শেষ করে অন্য আর একটা পৃথিবীতে তাঁর কাজ করতে গেছেন।'

গোপা আর পরিমল দুজনেই অদ্ভুত চোখে ভৈরবী মায়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। মাটিতে নামিয়ে রাখা থালা দুটোর দিকে তাকিয়ে এবার ভৈরবী মা বললেন, 'অনেক রাত হল। তোমরা এবার খেয়ে নাও। খেয়ে বিশ্রাম করো। চিন্তা কোরো না। বিকাশ আজ রাতের মধ্যেই এসে পড়বে। আর যদি সে আজ নাও ফেরে, তাহলেও চিন্তার কিছু নেই। তোমরা এখানে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে। কেউ তোমাদের বিরক্ত করবে না।' কথা শেষ করে ভৈরবী মা বেরিয়ে যান।

ওদের হতভম্ব ভাব তখনও কাটে না। পরিমল অবাক গলায় বলল, 'আমার সব কথা উনি টের পেলেন কী ভাবে? বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন নাকি?'

'উনি সেরকম মানুষ নন,' গোপা প্রতিবাদ করে, 'তবে ওঁকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল, উনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। চোখের দিকে তাকালে কেমন গা শিরশির করে। মনে হয় আমার ভেতরে কি হচ্ছে সব যেন উনি দেখতে পাচ্ছেন।'

পরিমল এবার খাবারের দিকে তাকায়। তারপর এগিয়ে এসে থালার ঢাকনা খোলে। দেখে খিচুড়ি ভোগ, আর তরকারি, ঢাকনা খুলতেই মিষ্টি একটা গন্ধ ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। গোপার দিকে তাকিয়ে পরিমল বলল, 'কই, এসো।'

'ও কি, তুমি যে হাত না ধুয়েই খেতে বসে গেলে!' গোপা গ্লাসের জল নিয়ে আসে।

খিচুড়ি ভোগ একবার মুখে দিয়েই পরম তৃপ্তিতে পরিমল শব্দ করে ওঠে, 'আঃ—।'

গোপা তাকায়, 'কি হল?'

পরিমল ঠাট্টার সুরে বলে, 'তোমার এই ভৈরবী মা-টি কোনও অলৌকিক ক্ষমতার

অধিকারী কিনা এখনও জানি না, তবে তাঁর রান্নার হাতটি যে দারুণ রকমেব লৌকিক, তা খিচুড়ি একবার মুখে দিয়েই বুঝতে পাবছি।'

খাওয়া-দাওয়ার পর দুজনেই শুয়ে পড়েছিল। অন্ধকার ঘরে অদ্ভুত নীরবতা। বাইরেও কোনও শব্দ নেই। শুধু একটানা ঝিঁঝি-র ডাক। শুয়ে শুয়ে গোপার মনে হচ্ছিল এই বিশ্ব সংসারে এ মুহূর্তে বোধহয় তাদের দুজন ছাড়া আর কারও অস্তিত্ব নেই। পরিমল পাশে শুয়ে আছে। গোপা একবার ভাবল তাকে ডাকে। পরক্ষণেই মনে হল সারাদিনের ক্লান্তিতে বেচারা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন ডাকাটা ঠিক হবে না। অর্থাৎ এই মুহূর্তে সে একা। অনুভবে একা, জাগরণে একা, অস্তিত্বে একা। বাইরে নিস্তব্ধ চরাচর সম্পূর্ণ তার অপরিচিত। আগামী পৃথিবীর প্রতিটা পদক্ষেপ অজানা। তার পারিপার্শ্বিকে বসবাসকারী মানুষগুলো একান্ত অচেনা। অসম্ভব অনিশ্চয়তায় দোদুল্যমান গোপার আগামী ভোরগুলো। তবু গোপা ঘুমোনোর চেষ্টা করল। বুকের ভেতরে চেনা শ্বাসের শব্দও এখন তাকে সঙ্গ দিতে নারাজ। প্রাণপণে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করল গোপা, চোখ বন্ধ করে আচ্ছন্নর মত পড়ে রইল।

কতক্ষণ এভাবে শুয়ে ছিল কে জানে। হঠাৎ খুট করে একটা শব্দ হতে চোখ মেলে তাকাল। আবছা অন্ধকারে দেখল অতি সাবধানে দরজার খিল খুলছে পরিমল। গোপা তাড়াতাড়ি উঠে বসে। পেছন থেকে ডাকে, 'নতুন জায়গা, এত রাতে বাইরে যেয়ো না।'

ধরা পড়ার ভঙ্গিতে চমকে ওঠে পরিমল। ইতস্তত করে বলে, 'কি করব বলো, ঘুম আসছে না যে!'

গোপা আবার শুয়ে পড়ে। বলে, 'নতুন জাযগায় ঘুম আসতে একটু দেরিই হয়। তাই বলে এত রাতে বাইরে বেরনোটা ঠিক নয়।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর চিন্তিত গলায় পরিমল বলে, 'ভৈরবী মা যে বললেন যত রাত্রিই হোক, বিকাশ আজ ফিবে আসবে। কই, কোনও শব্দ পেলাম না তো!'

'উনি না আসায় তোমার বুঝি খুব অসুবিধে হচ্ছে?'

'তা নয়। তবে বিকাশ না আসা অবধি শান্তি পাচ্ছি না, জানো!' পরিমল একই গলায় বলে।

'শুধু শুধু অস্থির হয়ে লাভ কি বল তো। উনি ঠিক চলে আসবেন। আর তাছাড়া ভৈরবী মা তো বললেন কোনও কারণে বিকাশবাবুর আসতে দেরি হলে আমরা এখানে থাকতেই পারি। কোনও অসুবিধে হবে না।'

পরিমল মাথা নাড়ে, 'তবুও, যার কাছে এলাম সে-ই যদি না থাকে, অন্য কারও কাছে দিনের পর দিন আতিথেয়তা নেওয়াটা ভাল দেখায় না। বিকাশের ফিরতে দেরি হলে, বুঝতে পারছি না এখানে থাকাটা আমাদের উচিত হবে কিনা।'

'সেটা কাল সকালে উঠে ভাবলেও চলবে। এখন শোবে এসো।' গোপা বলে।

পরিমল মাথা নাড়ে, 'তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। আমি একটু পরে শুচ্ছি।'

গোপা আবাব উঠে বসে। জেদী গলায় বলে, 'তুমি যদি এক্ষুনি বিছানায় না আসো,

তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে বাইরে গিয়ে বসব।'

পরিমল এবার বিরক্ত হয়। সে দরজায় খিল লাগিয়ে ফিরে আসে বিছানায়। চুপচাপ শুয়ে পড়ে পাশ ফিরে। গোপা নরম গলায় বলে, 'তুমি এত অস্থির হচ্ছ কেন? সবে তো একটা দিন আমরা বাড়ির বাইরে পা ফেলেছি, এখনই এত উতলা হলে চলবে কি করে?'

পরিমল দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলে ওঠে, 'তুমি বুঝতে পারছ না, একটা বিরাট ঝুঁকির মধ্যে জড়াতে যাচ্ছি। একেবারে নতুন জিনিস যার সম্বন্ধে আমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই, সঙ্গে টাকা-পয়সার চিন্তাটা তো আছেই। কয়েক লাখ টাকার বন্দোবস্ত করাটা কি অতই সহজ?'

'ও এই কথা! তা এতই যখন তোমার উদ্বেগ, তখন ওই ব্যবসা করার কথা ভাবতে গেলে কেন?'

'তুমি আমার কথাটা বুঝতে পারলে না। আমি বলতে চাইছি, প্রিন্টিংয়ের লাইনে আমার কোনও এক্সপিরিয়েন্স নেই। কীভাবে এগোতে হয় কিংবা ব্যবসায় নামার পর কীভাবে তাকে চালাতে হয়, কিছুই জানা নেই আমার, তাই ঠিক ভরসা পাচ্ছি না। সেটা কি খুব অসঙ্গত?' পরিমল গোপার দিকে তাকায়।

'হয়তো নয়। কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে এই গ্রামে এসে উঠলে কেন? এই সময়টা তো তোমার কলকাতায় থেকে প্রিন্টিংয়ের ট্রেনিং নেওয়া উচিত ছিল।' গোপা বলল।

পরিমল চিন্তিত গলায় বলে, 'ঠাট্টা করছ? করো।'

'ও মা! ঠাট্টা করব কেন?' গোপা অবাক হয়।

'কে আমাকে ট্রেনিং দেবে বল তো? আর কেনই বা দেবে?'

'এমনিতে হয়তো দেবে না। কিন্তু তুমি যদি তাদের হয়ে কাজ করে দাও, তাহলে হয়তো তারা শেখাতে রাজি হবে।'

প্রস্তাবটা পরিমলের মনে ধরে। সে একটু ভেবে বলে, 'ঠিক বলেছ। শুধু কাজ শেখা নয়, আমি যদি কোনও প্রেসে কর্মচারী হিসেবে ঢুকতে পারি তাহলে কাজ শেখার সঙ্গে সঙ্গে হাতে দুটো পয়সাও আসে। এটা ভালই বলেছ।'

গোপা হাসে, 'এরকম অনেক ভালই আমি বলতে পারি মশাই। তুমি শুধু একটু আমার কথা শুনে চলো, তাহলেই হবে।'

'আমি বুঝি তোমার কোনও কথা শুনি না?' পরিমল গোপাকে কাছে টানে।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন ঘুমোও। অনেক রাত হল। আর শোনো, বিকাশবাবু কালও যদি না আসেন তাহলে তুমি বরং কালই একবার কলকাতা ঘুরে এসো। প্রেসের কাজের একটু খোঁজ-খবর নিয়ে রাখলে কাজটা এগিয়ে থাকবে। আর তুমিও মনে অনেকটা জোর পাবে। কেমন?' গোপা পরিমলের বুকে মুখ গোঁজে।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে গোপা স্নান সেরে প্রথমেই একবার মন্দিরে ঘুরে এল। মন্দিরে রোজকার কাজকর্ম করার জন্য গ্রামের নির্দিষ্ট কয়েকজন সময়মত চলে আসে। গোপা দেখল তাদের কেউ ফুল তুলছে, কেউ ঠাকুরের বাসন-কোসন পরিষ্কার করছে,

কেউ চন্দন ঘষছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে গোপা ভৈরবী মাকে দেখতে পেল না।

সকালের ঝকঝকে রোদ্দুরে চারপাশটা কেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। গোপার বেশ ভাল লেগে গেল জায়গাটা। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরির পর গোপা ফিরে এল নিজেদের ঘরে। পরিমলও চা খেয়ে বেরিয়েছে। আপাতত কিছু করার নেই গোপার। বাইরে উৎসুক লোকজনের সামনে বেশিক্ষণ ঘুরতে অস্বস্তি লাগে। ভৈরবী মা কাল বলেছিলেন, এখানে থাকতে গেলে কিছু কিছু কাজ তাকে করতে হবে। কিন্তু ঠিক কি কাজ তা নির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি।

কি করবে ভেবে না পেয়ে গোপা একটা পত্রিকা খুলে বসেছিল খাটের ওপর। হঠাৎ একটা ভারী গলার আওয়াজে চমকে উঠল সে, 'এই যে ভদ্রমহিলা, আমার ঘরের দখল নিয়ে বসে আছেন, ঠিক চিনতে পারলাম না তো?'

অপ্রস্তুত গোপা চমকে খাট থেকে নেমে দাঁড়ায়, 'ও মা!'

হো হো করে হেসে উঠে বিকাশ ঘরে ঢোকে, 'কি, ভয় পাইয়ে দিয়েছি তো? ভয় পেয়ো না, আমি বিকাশ। আর তুমি গোপা বউদি, তাই তো?'

গোপা হাসে, 'আসলে... হঠাৎ করে গলাটা শুনলাম তো!'

'হুঁ, অপরিচিত গলা! ঘাবড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।' বিকাশ হাসে।

'একেবারে অপরিচিত কিন্তু নন আপনি।' গোপা বলে।

'তাই নাকি? তোমার সঙ্গে কবে আমার পরিচয় হল বলো তো?' বিকাশ ভুরু নাচায়।

'ওমা! আপনি ভুলে গেছেন? অনেকদিনের ব্যাপার অবশ্য। আপনি কলকাতায় গিয়েছিলেন, সেই সময় রাস্তায় আমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি ভুলিনি কিন্তু।'

বিকাশ চোখ বড় বড় করে বলে ওঠে, 'সে কি! আমার চেহারা এমন সুন্দর নাকি যে তোমার মত তন্বী সুন্দরীর তা মনে থেকে গেছে? ইস! আমার মা বেঁচে থাকতে থাকতে এ কথাটা যদি তাঁকে শোনাতে পারতে, তাহলে এ বান্দার জীবনটা আজ অন্যরকম হতে পারত।'

বিকাশের বলার ভঙ্গি দেখে গোপা হেসে ফেলে। জিজ্ঞাসা করে, 'কেন?'

বিকাশ এবার খাটে জমিয়ে বসে বলে, 'মা আমায় সবসময় কি বলতো জানো? আমার এই বাউণ্ডুলে চেহারা দেখেই নাকি কোনও মেয়ের আমাকে মনে ধরল না। কিন্তু ওই এক পলকের দেখাতেই তুমি আমাকে মনে রেখে দিয়েছ, একথা জানলে মা যে কি খুশি হত!'

এবার দুজনেই হেসে ওঠে। গোপা বলে, 'শুধু তাই নয় অবশ্য। আপনার বন্ধুর কাছ থেকে আপনার কথা এত শুনেছি যে মনে মনে একটা ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছিল।'

'ও ব্বাবা! তা কি বলেছে সে আমার সম্বন্ধে? কিন্তু গেল কোথায় মক্কেল?' বিকাশ ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

গোপা হাসে, 'ঘুম থেকে উঠে গ্রামে বেড়াতে গেছে।'

'গ্রামে বেড়াতে! সেকি! এ গ্রামে আছেটা কি যে বেড়িয়ে দেখতে হবে? ও কি এটাকে কলকাতা শহর ঠাউরেছে নাকি? চারদিকে শুধু চাষের জমি আর খেটে খাওয়া

মানুষদেব পরিশ্রমের ছবি। কোনও বৈচিত্র্য নেই। তবে হ্যাঁ, মিশে যেতে পারলে তোমাদের কলকাতা শহরের চেয়ে এ গণ্ডগ্রামের মায়া-টান অনেক বেশি করে বুঝতে পারবে।' বিকাশের গলায় অন্যরকম সুর।

গোপা এক মুহূর্ত চুপ থেকে প্রসঙ্গ পালটায়, 'আপনি কি আজই ফিরলেন বর্ধমান থেকে?'

'আরে না! কাল অনেক রাতে ফিরেছি। মায়ের কাছে রাতেই শুনেছি তোমাদের আসার কথা। তখনই ইচ্ছে হচ্ছিল ব্যাটাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলি। কিন্তু মা বারণ করলেন, তাই আর এলাম না।'

গোপা বলে ওঠে, 'ওমা, আসতে পারতেন। আপনার বন্ধুর তো ঘুমই আসছিল না আপনাকে না দেখে। সে কি চিন্তা! শেষে আমিই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘুমোতে পাঠালাম।'

'বলো কি! ব্যাটাছেলের এই অবস্থা নাকি? অবশ্য বরাবরই ও একটু দুর্বল স্বভাবের। অল্পেতেই কাতর হয়ে পড়ে। কি করে যে আমার মত ডাকাবুকো একটা ছেলের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হল কে জানে!'

বিকাশের কথা শেষ হওয়া মাত্রই দরজায় পরিমলকে দেখা গেল। বিকাশকে ওভাবে জমিয়ে বসে গল্প করতে দেখে সে হতভম্ব। বিকাশ তার ভাব দেখে বলে উঠল, 'কি রে ব্যাটা—ঘাবড়ে গেলি নাকি আমাকে দেখে? নাকি ভাবছিস তোর আগে তোর বউকে হাত করার তাল করছি!'

পরিমল কথার উত্তর না দিয়ে ছুটে এসে বিকাশকে জড়িয়ে ধরে। বিকাশ ওর পিঠ চাপড়ে দেয়। তারপর বলে, 'দাঁড়া, দাঁড়া, আগে তোকে ভাল করে দেখি। কতদিন পর দেখছি। একটু রোগা হয়েছিস মনে হচ্ছে!'

পরিমলের মুখ থেকে দুশ্চিন্তার চিহ্নেরা উধাও। সে একটু হেসে বলে, 'হতে পারে।'

বিকাশ জিজ্ঞাসা করল, 'কেন রে? বিয়ে করেছিস বলে নাকি? রোজগারের চিন্তায় চিন্তায় শুকিয়ে গেছিস নাকি?'

বিকাশ ঠাট্টা করলেও পরিমল শুকনো হেসে বলে, 'তা একরকম বলতে পারিস!'

'ঠিক ধরেছি।' বিকাশ বলে ওঠে। তারপর গোপার দিকে তাকিয়ে বলে, 'কিছু মনে কোরো না, এই জন্যেই ছেলেদের বিয়ে-সংসার এসব আমার দু-চক্ষের বিষ।'

পরিমল বিকাশের দিকে তাকায়, 'তুই কিন্তু একইরকম আছিস!'

'স্বাভাবিক।' বিকাশ কাঁধ ঝাঁকায়, 'আমি তো আর তোর মত জলজ্যান্ত একটা বউ নামক পদার্থকে ঘাড়ে করে ঘুরে বেড়াই না!'

'ঠিকই। তোর ঘাড় খালি থাকলে তবে তো! দুনিয়ার সব অসহায় মানুষের দায়িত্ব তোর ঘাড়ে।' পরিমল বলে।

'তা যা বলেছিস। তবে সব অসহায়ের দায়িত্ব আর ঘাড়ে নিতে পারলাম কই! এখানে যে কটা আছে তারাই নিঃশ্বাস ফেলতে দেয় না। তার ওপর গোদের ওপর বিষ-ফোঁড়ার মত এসে জুটেছে ওই ভৈরবী মা! এরপর বিয়ে করলে আর বউকে খাওয়াব কোত্থেকে বল তো?' বিকাশ চোখ নাচায়।

দরজায় ভৈরবী মার গলা পাওয়া যায়, 'কে কার ঘাড়ে এসে জুটেছে রে হতভাগা!

তখন থেকে শুনতে পাচ্ছি খুব ভাষণ দিয়ে যাচ্ছিস। তা আমাকেও ছেড়ে কথা বললি না?'

'ও মা' তুমি কি আমাদের সব কথা আড়ি পেতে শুনছিলে নাকি? এ ভারি অন্যায়।' বিকাশ ভৈরবী মাকে বলে।

ভৈরবী মা হেসে বলেন, 'তোর কথা শোনার জন্য আড়ি পাততে হবে না। ওই মন্দিরের চাতাল থেকে তোর গলা পাওয়া যাচ্ছে! আমি এলাম মেয়েটাকে ডাকতে।' বলে গোপার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'আয় মা!'

বিকাশ এবাব উঠে দাঁড়ায়, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তুমি কি করবে? দ্যাখো মা— ভাল কথা বলছি, ওরা আমার অতিথি। তোমার মন্দিরের সেবায়েত হবার জন্য ওরা কলকাতা থেকে এখানে আসেনি। আর যার ওপর জুলুম করো করো, ওদের ওপর কিন্তু তোমার জুলুম করা চলবে না, বলে দিলাম।'

'বেশ তো, তুই তোর বন্ধুকে নিয়ে যতখুশি বাউণ্ডুলেপনা করে বেড়া, আমি কিছু বলব না। কিন্তু ওই মেয়েটাকে তোবা আমার কাছে ছেড়ে দে।' বলে গোপার দিকে ফেরেন ভৈরবী মা, 'বাঃ, সকালবেলা উঠেই যে স্নান সেরে ফেলেছিস, এতে আমি খুব খুশি। এখানে সবাই ঘুম থেকে উঠেই স্নান সেরে নেয়। এবার আয়, আমার সঙ্গে মন্দিরে চল।'

গোপা তাড়াতাড়ি এগোতে যায়। বিকাশদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনারা বসে গল্প করুন। আমি আসছি এখন।'

বিকাশ হইহই করে ওঠে, 'এই, এই, এখানে থাকতে গেলে ওই আপনি-আজ্ঞেটা পার্মানেন্টলি ছাড়তে হবে। পরিষ্কার তুমি! তাছাড়া তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটাও দ্যাখো! শোনো, তুমি আমাকে বিকাশভাই বলে ডেকো। আমি শান্ত ছেলের মত তোমার হুকুম তামিল করে যাব। আর আমি তোমাকে ডাকব গোপা বউ বলে। আপত্তি আছে?'

গোপা কিছু বলার আগেই ভৈরবী মা বলে ওঠেন, 'তুই চল তো। ওই পাগলের সঙ্গে বকে গেলে সারাজীবন কেটে যাবে। ওরা ওদের মত থাকুক।'

ভৈরবী মা গোপাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বিকাশ সেদিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, 'গেল রে! আমার জীবনটা তো গেছেই—ভৈববী মায়ের পাল্লায় পড়ে তোর বউটাও গোল্লায় গেল এবার!'

পরিমল হাসে। বিকাশ উঠে গিয়ে দবজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আসে। তারপব ফিরে আসে খাটে। গুছিয়ে বসে। পরিমলের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তারপর বল—তোর প্রবলেমটা এখন কি অবস্থায় আছে?'

পরিমল চোখ তুলে তাকায়, 'আমার সবকটা চিঠিই পেয়েছিস নিশ্চয়?'

'হুঁ পেয়েছি।'

'একটা ছাড়া আর কোনটার উত্তর দিসনি কেন?'

'সেটাই আমার অভ্যেস। পাঁচটা চিঠি পেলে কোনরকমে একটার উত্তর দিই।' বিকাশ নির্বিকাব মুখে বলে।

'সত্যি, তুই না—!'

'দ্যাখ, চিঠি পেতে আমার খুব ভাল লাগে। কেউ তো আজকাল চিঠি লেখে না।

তুইও ঠেকায় পড়ে কটা লিখলি, নাহলে কি লিখতিস? কিন্তু চিঠি লিখতে আমার যে কি ক্লান্তি লাগে কি বলব তোকে। খুব উৎসাহ নিয়ে ভেবে ফেলি কি কি লিখব। কিন্তু লিখতে বসে আর শব্দ খুঁজে পাই না। কিছুক্ষণ হাওয়ায় হাতড়ানোর পর হাল ছেড়ে দিই। যাক গে, আসল কথাটা বল।' বিকাশ পকেট থেকে বিড়ি বের করে।

পরিমলের দিকে একটা এগিয়ে দিতে গেলে সে না করে। তারপর বলে, 'তোদের স্কুলে কোনও ভেকেন্সি নেই, না? একটা কিছু যদি আমার হয়ে যেত!'

'ওসব ভুলে যা। তিনজন টিচার মিলে দশজনের কাজ করি, তাতেও মাস গেলে ঠিকমত টাকা পাই না। সরকারের নাকি টাকা নেই। কাজেই এক্সট্রা টিচার রাখার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। যা চলছে, ঢিমেতালে তাই চলুক। সুতরাং ওসব লাইনে ভাবিস না। বরং তুই যে প্রেসের ব্যাপারটা বলেছিলি, সেটা নিয়ে আমি একটু ভেবে রেখেছি।' বিকাশ ধোঁয়া ছাড়ে।

'কীরকম?' পরিমল তাকায়।

'আমার একটা চেনা প্রেস আছে বেনিয়াটোলা লেনে। আমাদের স্কুলের প্রশ্ন-ট্রশ্ন ওখান থেকেই ছাপাই. আর বুঝতেই পারছিস এইসব ছাইভস্ম কাজ আমি ছাড়া করার কেউ নেই। সেই থেকেই ঘনিষ্ঠতা। তুই যদি ওখানে কাজ করতে চাস, তাহলে কথা বলে দেখতে পারি।'

'কাজ করতে চাইলেই কাজ হবে?'

'তা বোধহয় হবে। প্রেসের মালিক ভদ্রলোকের সঙ্গে মোটামুটি একটা কথা আমি বলে রেখেছি। বাকিটা তুই গিয়ে বলিস।'

'কি কি করতে হবে?' পরিমল জিজ্ঞাসা করে।

'এই প্রুফ দেখা অর্ডার ধরা, এই সব আর কি, এসবগুলো মোটামুটি জানা থাকলে পরবর্তীকালে তোর নিজের কাজেও লাগবে।' বিকাশ বলে।

'সেটা গোপাও আমাকে বলছিল। কিন্তু আমি অন্য দিকটাও ভাবছি। কাজকর্ম না হয় শিখতে শুরু করলাম, কিন্তু আমার ব্যবসার ব্যাপারটা কতদূর কি হবে?'

'দ্যাখ, ছাপাখানা খুলব বললেই তো আর হল না। আমাদের ধাপে ধাপে এগোতে হবে। একেবারে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বসে ছক করে ফেলতে হবে, কীভাবে কাজটা শুরু করা যায়। তুই কিছু ভেবেছিস?' বিকাশ তাকায় পরিমলের দিকে।

পরিমল মাথা নাড়ে। বিকাশ হাসে, 'তুমি শালা উকিলের পো। সারাজীবন সুখে জীবন কাটিয়ে এখন বিয়ে করে মুশকিলে পড়েছ। বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানই নেই। এভাবে চললে হবে? কিছুই কাজ এগোবে না।'

'সেই জন্যেই তো তোর কাছে এলাম। একা একা কত আর ভাবব। ওখানে তো আমাকে হেল্প করারও কেউ নেই। এখন আমার আসল চিন্তা টাকার জোগাড় কোথা থেকে করব।' পরিমল বলে।

'উঁহু, ওটা একমাত্র চিন্তা নয়। এই জন্যেই তোকে বললাম, কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বোস। পয়েন্ট কর, কি কি বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে। শুধু টাকার জোগাড় করলেই হবে? আর একটা বড় ব্যাপার মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললি কীভাবে? প্রেসটা করবি কোথায়? তার জন্যে তো একটা জায়গা চাই। কিন্তু আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, তুই

হঠাৎ প্র্যাকটিস ছেড়ে প্রেসের কাজে নামতে চাইছিস কেন? বেশ হতো বাবার সঙ্গে কোর্টে প্র্যাকটিস করছিলি!'

'সে অনেক ঘটনা। একদিনে সব বলা যাবে না। তবে ওই লোক-ঠকানো প্রফেশনে আমি মানিয়ে নিতে পারছিলাম না, এটুকু বলতে পারি।'

'আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। গোপাবউকে তুই পছন্দ করে বিয়ে করেছিস, নাকি ওকে তোর বাবা-মা পছন্দ করেছেন?'

পরিমল একটু ভেবে বলে, 'দুটোই সত্যি বলতে পারিস। তবে সেটাও একটা গল্পকথা।'

'বলিস কি রে! এখানেও গল্প! এই ক'বছরের মধ্যে তোর জীবনে এতকিছু গল্প তৈরি হয়ে গেল?' বিকাশ চোখ বড় বড় করে বলল।

পরের দিনই বিকাশের লেখা চিঠি নিয়ে পরিমল কলকাতায় রওনা হল। পবিমলকে দেখে গোপার মায়া হচ্ছিল। অকারণেই নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল। বিকাশও বেরিয়ে গেল স্কুলে। সকালটা মন্দিরের কাজ নিয়ে বেশ কেটে যায়। ভৈরবী মা তাকে মন্দিরের কাজ শেখাচ্ছেন। গোপারও বেশ ভাল লাগছে। এর মধ্যেই গ্রামের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। মানুষগুলো বেশ সহজ সরল। ঈশ্বরে দারুণ ভক্তি। আর ভৈরবী মায়ের ওপর অগাধ বিশ্বাস। গোপাকে একদিনেই তারা আপন করে নিয়েছে। মনের গভীরে দুশ্চিন্তা থাকলেও গোপার তাই একটা আলগা ভাল লাগা তৈরি হচ্ছিল। দুপুরের খাওয়া সেরে গোপা শুয়েছিল নিজের ঘরে। এখানে নির্দিষ্ট কয়েকজনের রান্নার ব্যবস্থা আছে। সবই নিরামিষ রান্না। তবে অতি সুস্বাদু। ভৈরবী মা নিজে সব কিছুর তত্ত্বাবধান করেন। দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যেস কোনও দিনই ছিল না গোপার। চুপচাপ শুয়ে এলোপাথাড়ি চিন্তা করছিল তাই। হঠাৎ শরীরটা গুলিয়ে উঠল। গোপা তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসল। কীরকম একটা পাক দেওয়া অনুভূতি শরীরে। গোপা কি করবে ভেবে না পেয়ে নেমে বেরোতে যায়। এসময় মাথাটা ঝট করে ঘুরে গেল তার। দরজা ধরে সামলালো সে। কিন্তু শরীরটা আবার পাক দিয়ে উঠতেই সে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল। বাথরুমের কাছে ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে হড়হড় করে বমি করে ফেলল সে। অনেকক্ষণ পর শরীরটা একটু শান্ত হল। গোপা চোখে-মুখে জল দিয়ে উঠে দাঁড়াতে যাবে, দেখল ভৈরবী মা এগিয়ে আসছেন তার দিকে। কাছাকাছি এসেই তাকে ধরে ফেললেন। তারপর তীব্র চোখে তার দিকে চেয়ে রইলেন। গোপা সে দৃষ্টি সহ্য করতে পারল না। চোখ নামিয়ে নিল সে। ভৈরবী মা মৃদু হাসলেন, 'কি রে বেটি, আর একটা মায়ায় জড়িয়ে পড়লি তো!'

গোপা চমকে তাকাল। এরকম একটা সন্দেহ তার হচ্ছিলই। কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পারছিল না। অদ্ভুত এক লজ্জাবোধ তৈরি হচ্ছিল। এমনকি পরিমলকেও বলতে পারেনি। যতক্ষণ না নিজের কাছে পরিস্কার হচ্ছিল, তার আগে কিছু বলতে চায়নি সে। কিন্তু এখন এই অদ্ভুত দৃষ্টিব সামনে সে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল। ভৈরবী মা তাকে ধরে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। গোপার শরীরে মনে অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। জীবনে এরকম মুহূর্ত বোধহয় আব আসেনি তার। ভীষণ ইচ্ছে করছে এ-মুহূর্তে

পরিমলকে পাশে পেতে। ভৈরবী মা বোধহয় তার মনের ভাষা পড়তে পারলেন। গোপার মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে বললেন, 'ধৈর্য ধর রে মেয়ে। একটা ভাল কাজে গেছে সে। দ্যাখ হয়তো আজ এই শুভ সংবাদটা পাওয়ার আগেই অন্য একটা সুসংবাদ সে নিয়ে আসবে। কিংবা কে বলতে পারে, এর পরই হয়তো তোর স্বামী একটা দিশা খুঁজে পাবে!'

গোপা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ভৈরবী মায়ের কোলে মাথা রেখে হু-হু করে কেঁদে উঠল। ভিতরের অবরুদ্ধ আবেগরা সব একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে লাগল। বাচ্চা মেয়ের মত মায়ের কোলে মাথা রেখে গোপা ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকল।

ভৈরবী মা বাধা দিলেন না। শান্তভাবে বসে গোপার পিঠে হাত বুলোতে লাগলেন। ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলে গোপা মাথা তুলল। ভৈরবী মা হেসে বললেন, 'কি রে, ভয় করছে?'

গোপা মাথা নাড়ায়, 'না।'

'তাহলে? এত ভেঙে পড়লে চলবে? এখন তো তোর নতুন শক্তি দরকার। বেঁচে থাকার মানেটা নতুন করে শিখতে হবে। আর শুধু নিজের জন্য নয়, তোকে বাঁচতে হবে ফুলের মত সুপ্ত একটা প্রাণের জন্য। যে প্রাণের বীজ আজ তোকে সংকেত দিল সে আসছে।'

গোপা অবাক হয়ে ভৈরবী মায়ের দিকে তাকাল, 'আপনি কি করে বুঝলেন?'

ভৈরবী মা স্নেহের সুরে বললেন, 'আমি যে মা রে! সন্তানের কোনও কথা মায়ের কি অজানা থাকে? তবে আবারও বলছি, মনটাকে শক্ত করে ফেল। একেবারে পাথরের মত। সামনের রাস্তাটা মসৃণ নয়। তোকেই সেই অমসৃণ পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে। সে পথে সবাই যে তোর বন্ধু তা নয়—তবে তোকেই তা চিনে নিতে হবে। কে তোকে হাত ধরে এগিয়ে দেবে আর কে তোকে পিছনে টানবে! আমার বিশ্বাস তুই তাদের চিনতে পারবি। নিশ্চয় পারবি। তোর সে ক্ষমতা আছে।'

গোপা অবরুদ্ধ গলায় বলল, 'আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।'

'ওরে মেয়ে, মায়ের আশীর্বাদ সবসময় মেয়ের সঙ্গে থাকে। তবে তুই তোর স্বামীটার দিকেও নজর রাখিস। ব্যাটাছেলেটা বড্ড ভালমানুষ গোছের। এমন মানুষের জন্য এ পৃথিবীটা নয়। ওকে সামলে রাখার দায়িত্ব এখন তোর।'

গোপা খানিকক্ষণ নীরবে বসে থাকে। ভৈরবী মা বলেন, 'চল, তোকে তোর ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি। একটু বিশ্রাম নে। আজ আর উঠিস না। কিছু দরকার হলে ডাকবি, আমিই যাব।'

শরীরটা সত্যিই দুর্বল লাগছিল গোপার। ভৈরবী মায়ের সঙ্গে নিজের ঘরে ফিরে এসে সে শুয়ে পড়ল। জানলার পর্দাগুলো টেনে দিয়ে, মাথার কাছে এক গ্লাস জল ঢাকা দিয়ে রেখে ভৈরবী মা বেরিয়ে গেলেন। আবছা অন্ধকারে গোপার চোখ ক্লান্তিতে বুজে এল।

॥ ২ ॥

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল কে জানে। ঘরের মধ্যে খুট করে আলো জ্বলে উঠতে গোপা হকচকিয়ে উঠে বসল। মুহূর্তের জন্য সে বুঝতে পারছিল না কোথায় আছে। তাকে ওই অবস্থায় দেখে পরিমল বেশ ঘাবড়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি বিছানার কাছে গেল, 'কি হল, শরীর খারাপ নাকি?'

বিকাশও এসেছিল পিছু পিছু। ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে এগিয়ে এল, 'ওমা! গোপাবউ, স্বামী একদিন একটু বাইরে গেছে, একবেলাব মধ্যে অমনি শুকিয়ে যে একেবারে অর্ধেক হয়ে গেলে! হায়রে স্ত্রী জাতি! তোমাদের বোঝে কার সাধ্য!'

ওর বলার ভঙ্গি দেখে গোপা না হেসে পারল না। সে উঠে বসল। মাথাটা এখনও ভার-ভার লাগছে। পরিমলের চিন্তিত মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'আমার কিছু হয়নি কিন্তু তোমার ফিরতে এত দেরি হল যে?'

ক্লান্ত শরীরে পরিমল চেয়ারটা টেনে বসে পড়ে, 'আর কি! অনেকগুলো জায়গায় ঘুরলাম যে!'

'অনেকগুলো জাযগায় মানে?' বিকাশ বলল, 'আমি যে তোকে লালমোহনবাবুর কাছে পাঠালাম, যাসনি?'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। তারপর ওখান থেকে আবার বেরিয়েছিলাম।' পরিমল বলল।

'ও! তা কি বললেন উনি? আমার চিঠিটা দেখিয়েছিলি?'

পরিমল মাথা নাড়ে, 'না রে, তার আর দরকার হয়নি। মানুষটা এমনিতেই বেশ ভাল দেখলাম। তোর নাম করতেই এত খাতির করে বসালেন যে কি বলব। তারপর চা, বিস্কুট খাইয়ে অনেকক্ষণ কথা বললেন।'

'কাজের কাজ কিছু হল?' বিকাশ জানতে চাইল।

'কাজের কাজ মানে, ওই, তুই যা বলেছিলি। উনি সব শুনলেন। তারপর বললেন, দ্যাখো ভাই, আমি আর তোমাকে কতটুকু সাহায্য করতে পারি বলো, তবে এখানে কাজ করলে হাতে-কলমে ব্যাপারটা শিখতে পারবে, নিজে ব্যবসায় নামার আগে যেটা খুব জরুরি। তার সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার ধরার কাজটাও বললেন।' পরিমল ক্লান্ত স্বরে বলল।

'অর্ডার ধরার কাজ মানে? তোমাকে ঘুরে ঘুরে অর্ডার আনতে হবে নাকি?' গোপা বিস্মিত কণ্ঠে বলে।

পরিমল গোপার দিকে তাকায়। তারপর বলে, 'সে তো আনতেই হবে। শুধু তো একটা মেসিন কিনে দোকান সাজিয়ে বসলেই হবে না। ছাপাব যে, সেই অর্ডারগুলো তো চাই। সেগুলো খুঁজে বের করতে তো হবেই।'

'কোথায় পাবে সেগুলো?' গোপা জিজ্ঞাসা করে।

'বিভিন্ন অফিসে, দোকানে, কোম্পানিতে যোগাযোগ করতে হবে।'

'কিন্তু তুই তো এলাইনে কাউকে জানিস না। কি করে অর্ডার জোগাড় করবি?' বিকাশ জানতে চায়।

'সে লালমোহনবাবু এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবেন বলেছেন। ওঁর জানাশোনা

জায়গাগুলোয় প্রথমে যাব। তারপব নিজেরই আস্তে আস্তে যোগাযোগ তৈরি হয়ে যাবে।'

পরিমল মাথা নাড়ে। তারপর বলে, 'লালমোহনবাবুর প্রস্তাব আমার ভালই লেগেছে। আমি রাজি হয়ে গেছি।'

গোপা মুখ গম্ভীর করে বসেছিল। বিকাশ সেটা লক্ষ করে বলল, 'ওই দ্যাখ, দুপুর রোদে ফেরিওয়ালার মত রাস্তায় ঘুরে ঘুরে অর্ডার ধরবি শুনে তোর বউয়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে। খুব স্বাভাবিক সেটা। সত্যি পরিমল, কি বাড়ির ছেলে তুই। ওকালতি পাশ করেছিস। কোথায় এখন তোর পুরোদমে হাইকোর্টে প্র্যাক্টিস করার কথা, তা নয়, রাস্তায় ঘুরে ঘুরে অর্ডার ধরে বেড়াবি! এসব কি তোকে মানায়?'

পরিমল চুপ করে থাকে। কথার কোনও উত্তর দেয না। বিকাশ কি বলবে ভেবে পায় না। বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর পরিমল গোপাকে বলে, 'কি ভাবছ গোপা?'

গোপা নিঃশ্বাস ফেলে, 'না, কিছু না। ভাবছি তোমার খুব কষ্ট হবে।'

পরিমল শুকনো হাসে, 'কষ্ট করলে তবেই তো কেষ্ট মেলে! কোনও দিকেই তো কিছু করতে পারছিলাম না। একটা অন্তত আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। দেখি না, শেষ অবধি কি হয়!'

'ঠিক হ্যায়! আমি তাহলে এখন উঠি। তুই হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম কর।' বিকাশ উঠে দাঁড়ায়।

বিকাশ বেরিয়ে গেলে পরিমল উঠে এসে খাটে বসে। গোপার দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোমার কি হয়েছে বল তো? ভীষণ অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে! সত্যিই শবীর-টরীর খারাপ নাকি?'

গোপা ম্লান হাসে, 'না গো, শরীর খারাপ কিছু না। তবে তোমার কথা ভাবলে সত্যিই খারাপ লাগছে। আজ আমার জন্যই তোমাকে এই অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে। এত অপবাধী লাগে মাঝে মাঝে নিজেকে।'

'প্লীজ গোপা, এরকম বোলো না। কোথায় তুমি আমাকে উৎসাহ দেবে, শক্তি যোগাবে, তা না, এসব কথা বলে আমার মনটা ভেঙে দিচ্ছ। তুমি পাশে না থাকলে আমি এগোব কি করে বলো তো?' পরিমল গোপার হাতদুটো নিজেব হাতে টেনে নেয়।

গোপা অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছিল। পরিমলের স্পর্শ পেয়ে এবার ভেঙে পড়ে। সে পরিমলের কাঁধে মাথা রাখে। পরিমল তাকে আরও কাছে টেনে নেয়। তারপর নিঃশব্দে মাথায় হাত বোলাতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে থাকার পর গোপা উঠে দাঁড়ায়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে। পরিমলকে তাড়া মারে তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে আসার জন্য। খাওয়াব সময় হয়ে গেছে। এখানে তাদের মর্জিমাফিক কাজ হবে না। তাদেরকেই এখানের নিয়ম অনুযায়ী চলতে হবে। পরিমল ওঠে। তোয়ালেটা নিয়ে কুয়োতলার দিকে এগিয়ে যায়।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ওরা চুপচাপ শুয়েছিল বিছানায়। ঘর অন্ধকার। এখানে সন্ধে থাকতেই সব চুপচাপ হয়ে যায়। এখন সবে এগারোটা। কলকাতায এসময় অনেকদিন পরিমল আলো জ্বালিয়ে পড়াশোনা করত। গোপাও বই পডত অথবা গল্প কবত। কিন্তু

এখানে মনে হচ্ছে নিষুতি রাত। কোথাও কোনও শব্দ নেই। বাইরে হাওয়া দিচ্ছে। মাঝে মাঝে গাছের পাতার শব্দ শোনা যাচ্ছে। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো ছিটকে এসে মেঝেতে আঁকিবুকি খেলছে। গোপার ভেতরে ভেতরে ভীষণ অস্থিরতা লাগছিল। দুপুর থেকে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসেছিল পরিমলের জন্য। অথচ এখন পাশে পেয়েও অদ্ভুত এক জড়তা তাকে ঘিরে ধরেছে। তার সব থেকে ঘনিষ্ঠ মানুষটির কাছেও নিজেকে উন্মুক্ত করতে পারছিল না। পরিমল গোপার এই অস্থিরতা ধরতে পারল। সে গোপাকে বুকে টেনে নিল, 'কি হয়েছে সত্যি করে আমায় বলবে? কেন লুকোচ্ছ আমাকে?'

পরিমলের বুকে মুখ গুঁজে গোপা মাথা নাড়ে, 'তোমাকে লুকোনোর আমার কিছু নেই। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না তোমাকে কীভাবে বলব।'

পরিমল গোপার মুখ তুলে ধরে, 'এই তো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলো।'

গোপা এক মুহূর্ত ভাবে। তারপর চোখ নামিয়ে বলে, 'আমাদের নতুন অতিথি আসছে।'

পরিমল প্রথমে ধরতে পারে না। পরমুহূর্তেই ধড়মড় করে উঠে বসে। গোপার দিকে অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, 'কি বললে! আর একবার বলো।'

গোপা সলজ্জ গলায় বলে, 'বললাম তো, আমাদের নতুন অতিথি আসছে।'

'সত্যি?' পবিমল চেঁচিয়ে ওঠে।

গোপা তাড়াতাড়ি তার মুখ চেপে ধরে, 'আস্তে আস্তে, চেঁচিয়ো না।'

পরিমল গোপার হাত সরিয়ে ওকে জড়িয়ে ধবে, তারপর অভিমানী গলায় বলে, 'এই কথাটা এতক্ষণ ধরে চেপে রেখেছিলে তুমি?'

গোপা ওকে জড়িয়ে ধরে, 'আমার কেমন লজ্জা লাগছিল।'

পরিমল অবাক হয়ে গোপার দিকে তাকায়, 'লজ্জা লাগছিল! আমাকে! সত্যি তুমি পারো।' মাথা নাড়ায় পরিমল। তারপর হঠাৎই অন্যমনস্ক গলায় বলে ওঠে— 'কিন্তু—'

গোপা পরিমলের দিকে তাকায়, 'কিন্তু কি?'

'গোপা, এই অবস্থায় তোমাকে বাড়ির বাইরে নিয়ে এসে ঠিক করিনি আমি।'

'খুব ঠিক করেছ। জানো, এই সময় ছেলেদের উচিত সবসময়ে বউয়ের মন যাতে খুশি থাকে সেই দিকে নজর রাখা। তুমি কি মনে করো, তোমাদের বাড়ির ওই পরিবেশে থাকলে আমার শরীর মন খুব ভাল থাকত?'

'তা নয়। তবু ও বাড়িতে অনেক লোকজন ছিল, তারা তোমার যত্ন-আত্তি করতে পারত।' পরিমল সহানুভূতির স্বরে বলল।

গোপা হেসে ফেলে, 'তুমি কি বলো তো? এমন করছ, যেন আমি কোনও বিরাট বাড়ির মেয়ে। আরে বাবা, তোমার বউ খুব সাধারণ বাড়ির অতি আটপৌরে একটা মেয়ে। তার কাজকর্ম করার যথেষ্ট অভ্যেস রয়েছে। বরং শুয়ে বসে থাকলেই যত অসুবিধে। তাছাড়া এ দেশের কটা মেয়ে এ অবস্থায় সারাদিন শুয়ে বসে থাকতে পারে বলো তো? অনেককে তো দুবেলা খাবারটুকু জোটাতে এ অবস্থাতেও হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়। তুমি কিছু চিন্তা কোরো না, আমি একদম ঠিক থাকব এখানে। এখানকার পরিবেশ আমার খুব ভাল লেগেছে।' গোপা ধীরে ধীরে কথাগুলো বলে থামল।

পরিমল এ সময় আবার কাছে টেনে নেয় গোপাকে। তারপর বলে, 'জানো, মাঝে মাঝে নিজের জন্য বড্ড করুণা হয়। নিজের ভাগ্যের ওপর রাগ হয়। মনে হয় কার দোষে আমার এই অবস্থা! আমার নিজের—নাকি ভাগ্যের, যার ওপর আমাদের কোনও হাত নেই। তবু তার মধ্যেও মাঝে-মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে হয়। আগের জন্মে নিশ্চয়ই কিছু পুণ্য করেছিলাম নইলে তোমায় পেলাম কি করে?'

গোপা পরিমলের বুকে হাত রাখে, 'অনেক রাত হয়েছে, এবার ঘুমোও।'

'হ্যাঁ।' পরিমল শুয়ে পড়ে। তারপর বলে, 'অদ্ভুত একটা ভাল লাগছে, জানো! মনে হচ্ছে জীবনটা যেন পূর্ণতা পেতে চলেছে। মনের মধ্যে যেন নতুন করে কাজের উৎসাহ পাচ্ছি।'

গোপা শুয়ে পড়ে পরিমলের পাশে, 'হ্যাঁ, এবার কিন্তু আমরা আর একা নই। আমাদের দায়িত্ব বোধহয় অনেক বেড়ে গেল। আগামী কালটা আমাদের কাছে নতুন জীবনের বার্তা নিয়ে আসবে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কবি আমরা যেন সবসময় সত্যের মধ্যে থাকতে পারি।'

॥ ৩ ॥

দিনগুলো এভাবেই কেটে যাচ্ছিল। ক্রমশ এই পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নিচ্ছিল ওরা। পরিমল লালমোহনবাবুর প্রেসে কাজ নিয়ে নিল। মগরা থেকেই রোজ কলকাতায় যেতে হত তাকে। প্রথম প্রথম কষ্ট হলেও এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। লালমোহনবাবু মানুষটা ভাল। পরিমলকে বেশ স্নেহ করেন। হাতে ধরে খুঁটিনাটি কাজগুলো শিখিয়ে দেন। প্রেসের কাজ ছাড়াও দুপুরের দিকটা পরিমলকে বেরোতে হয় অর্ডার ধরার জন্য। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটা অর্ডার নিয়ে এসেছে সে। তার মধ্যে গোটাদুয়েক নতুন অর্ডারও আছে। লালমোহনবাবু খুব খুশি এতে। এটুকু বুঝেছেন তিনি ছেলেটা সৎ এবং পরিশ্রমী। গোপাও ভৈরবী মায়ের আশ্রমের কাজে লেগে গেছে। এ অবস্থায় তাকে দিয়ে কোনও ভারী কাজ যদিও করান না তিনি, তবু ফুল তোলা পুজোর জোগাড় করা, রান্নায় সাহায্য করা এসব হালকা কাজ গোপা করে। রান্নাটা ভৈরবী মা নিজের হাতেই করেন। গোপা ছাড়া আর দু-একজন মেয়ে তাঁকে সাহায্য করে। এরা সবাই আশ্রমের আশেপাশে থাকে। গোপার সঙ্গে এদেরও বেশ ভাব হয়ে গেছে। যদিও ভাবনা-চিন্তা কোনদিক থেকেই এদের সঙ্গে তার মেলে না, তবুও মানুষগুলো সহজ-সরল খোলামেলা। কখনও গোপার সম্বন্ধে বাড়তি কিছু জানতে চায় না। হঠাৎ করে গোপা কেন এখানে এসে থাকছে এ প্রশ্নের মুখোমুখি হলে কি বলবে সে গোপা কিছুতেই ভেবে পেত না। নিজের দুঃখের কাহিনী সাতকাহন করে বলে বেড়াতেও সে উৎসাহী নয়। তবে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা না করায় সে একটু অবাকই হয়েছে। তার ধারণা এর পেছনে ভৈববী মা-র হাত আছে। তিনিই এদের সবাইকে নিষেধ করেছেন এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করতে। যাই হোক, গোপা এর জন্য মনে মনে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। অবশ্য শুধু এর জন্যই নয়, অদ্ভুত এক আকর্ষণী শক্তি আছে ভদ্রমহিলার। গোপা ক্রমশ যেন তাঁকে আবিষ্কার করছে। কোনও মন্ত্র-তন্ত্র, ভূত-ভবিষ্যৎ বলে চমক লাগাতে চান না। তবু গ্রামের মানুষ কি

নিঃসঙ্কোচে তাঁকে সমস্ত সমস্যার কথা বলে। তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করেন তাদের সাহায্য করতে। অদ্ভুত এক অন্তর্দৃষ্টি আছে তাঁর। কারও দিকে তাকালে সেই দৃষ্টির সামনে সে বাধ্য হবে আত্মসমর্পণ করতে। আবার অদ্ভুত স্নেহময়ী জননী তিনি। যেন সকলের আশ্রয়দাত্রী। সবার সব দুঃখ ভাগ করে নিতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত। এত সবের মাঝেও আশ্রমের প্রতিটি খুঁটিনাটির দিকে তাঁর দৃষ্টি। ঠিক সময়মত আর নিয়মমত আচারবিধি পালন করে চলেন তিনি। গোপা যত দেখছে তত মুগ্ধ হচ্ছে। কি নিঃশব্দে গোপাকে আগলে চলেন উনি, কিন্তু বুঝতে দেন না। একলা থাকলেই যাতে মনখাবাপ না করে, গোপাকে তাই দুপুরবেলায় নিজের ঘরে নিয়ে যান উনি। সারাদুপুর নানারকম গল্পে কেটে যায়। কখনও নিজেব জীবনের গল্প কখনও গোপার কথা শুনে দুপুব গড়িয়ে বিকেল হয়ে যায়।

এর মধ্যে প্রেসের কাজ সেরে বেবিয়ে পরিমল কয়েকদিন অন্যান্য কযেকটা জায়গাতেও খোঁজখবর নিয়েছে। নতুনভাবে শুরু করার যা খবচ তা সে পেরে উঠবে বলে মনে হয় না। তাই লালমোহনবাবুব কাছ থেকে খবর নিযে সে দু-তিন জায়গায গিয়েছিল পুরোনো প্রেস বিক্রি হবে জেনে। তার মধ্যে পটুয়াটোলা লেনের একটা প্রেসের সঙ্গে কথাবার্তাও কিছুটা এগিয়েছে। প্রেসের মালিক তাঁর পুরোনো মেশিনপত্র সমেতই বিক্রি কবতে চান। কিন্তু সেসব কতটা কাজের উপযুক্ত আছে তা বোঝার জন্য একদিন লালমোহনবাবুকে নিয়ে যেতে চায় পরিমল। টাকা-পযসার কথাও মোটামুটি একটা হয়েছে। সেটা জোগাড় করতেও পরিমলকে হিমশিম খেতে হবে। ভদ্রলোক এককালীন টাকা পেতেই বেশি উৎসাহী। কিস্তির ব্যাপারে কথা বলে যা দাঁড়াল পরিমল দেখল তাতে অনেকটাই বেশি পড়ে যাচ্ছে। কযেকটা দিন সময় চেয়ে সে চলে এসেছিল। কিন্তু তারপব দিনদুয়েক কাজের এমন চাপ ছিল যে এব্যাপারে আর কিছু ভাবাব অবকাশ পায়নি। গোপাকেও কিছু জানাযনি সে। এ অবস্থায় অযথা ওকে উৎকণ্ঠার মধ্যে ফেলাব মানে হয় না। কাজটা কিছুদূর এগোলে গোপাকে জানাবে ভেবে বেখেছিল।

কিন্তু আজ তার মন ভেঙে গেছে। গোপার সঙ্গে এব্যাপারে কথা তাকে বলতেই হবে। তাছাড়া আব কার কাছেই বা আলোচনা করবে! বিকাশকেও সব জানানো দরকাব। কিন্তু তার আগে গোপার সঙ্গে কথা বলাটা জরুরি। লালমোহনবাবুর প্রেস থেকে বেরিযে আজ সন্ধ্যেবেলা কাজলের বাড়িতে গিয়েছিল পরিমল। মগরায় আসার আগেও একবাব ওর সঙ্গে কথা হয়েছিল। তখন কাজল বলেছিল ওর ব্যাঙ্ক থেকে লোনের একটা বন্দোবস্ত করার ব্যাপারে পরিমলকে সাহায্য করবে। কিন্তু লোন পেতে গেলে যেসব শর্তগুলো পূরণ করতে হয় তার কোনটাই পরিমলের হাতে ছিল না। কাজল ওর সমস্যাব কথা শুনে বলেছিল ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলবে। যদি অন্যভাবে কিছু ব্যবস্থা করা যায়। পরিমল সেই আশাতেই গিযেছিল। কিন্তু কাজল জানিয়েছে লোন পেতে গেলে ব্যাঙ্কেব শর্তগুলো তাকে পূরণ করতেই হবে, অন্যথায় কোনও ব্যবস্থা সম্ভব নয়। সুতবাং পরিমল পুরোপুরি হতাশ।

রাত্রে গোপাকে বলতেই হল কথাটা। একা একা কি করবে ঠিক কবতে পারছিল

না পরিমল। ও দেখেছে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তই ও একা নিতে পারে না। পতিতপাবন রায়ের ছত্রছায়ায় থেকে এতদিন অবধি কোনও সিদ্ধান্তই ওকে নিতে হয়নি। এমনকি নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছেগুলোর ওপরও ওর কোনও হাত ছিল না। হয়তো এসবের কারণেই ওর ব্যক্তিত্ব ঠিকঠাক গড়ে ওঠেনি। সবসময়ই কারও না কারও সাহায্যের দবকার হয়।

সব শুনে গোপাও বুঝে উঠতে পারছিল না কি করা উচিত। ব্যাঙ্ক থেকে লোন নেওয়া ছাড়া যে অতগুলো টাকা অন্য কোথাও থেকে পাওয়া যাবে না সেটা সে ভালই বুঝতে পারছিল। কিন্তু বন্ধক রাখার ব্যাপারে সে কিছু স্থির করতে পারছিল না। বাগবাজারের বাড়ি ঠাম্মা দুই নাতিকে দিয়ে গেলেও পতিতপাবন রায় যে সে বাড়ি হাতছাড়া করবেন না একথা গোপা বেশ ভালভাবেই জানে। একমাত্র হাতে আছে তাদেব নিজেদের বাড়িটা। ও বাড়িব উইল গোপার মায়েব নামেই করা। কিন্তু মাকে একথা বললে যে বড়ই ছোট হয়ে যাবে নিজের কাছে। মা হয়তো মুখে কিছু বলবেন না, মেয়ের মুখ চেয়ে নিঃশব্দে সব মেনে নেবেন, কিন্তু মনে মনে নিশ্চয়ই কষ্ট পাবেন। কারণ ওই বাড়ি বাবা একটু একটু করে তৈরি করিয়েছেন। বাড়ির প্রত্যেকটা কোণে বাবার স্মৃতি ছড়িয়ে আছে, সেই সঙ্গে দাদা। মা একলা ওই বাড়িতে সেসব স্মৃতিকে সঙ্গে করেই যে বেঁচে আছেন তা গোপা ভাল করেই জানে। সব জেনেশুনে তাই মাকে এই প্রস্তাব দিতে সে বড়ই কুণ্ঠা বোধ করছিল।

কিন্তু পরিমলের অসহায় মুখ আর অস্থির পায়চারি তাকে দুর্বল করে দিল। সব দ্বিধা সরিয়ে রেখে সে পরিমলকে বলল একদিনের জন্য তাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে। সে তার মায়ের সঙ্গে কথা বলবে। পরিমলেবও এ ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলেও নিরুপায় হয়ে সে সব মেনে নিল। ঠিক হল লালমোহনবাবুকে বলে একদিনের ছুটি নিয়ে নেবে পরিমল। তারপর গোপাকে নিয়ে তার বাড়িতে যাবে কথা বলতে। গোপার মা রাজি থাকলে সেদিনই গিয়ে কাজলের অফিসে সব জানাবে। এভাবে দিন কাটানোর চেয়ে একটা ঝুঁকি তাকে নিতেই হবে।

পরের দিন প্রেসে গিয়েই লালমোহনবাবুকে বলে পরিমল ছুটির ব্যবস্থা করেছিল। গোপা ভৈরবী মাকে সব বললে তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন গোপাকে যাতে ভালোয় ভালোয় সব মিটে যায়। সেই-সঙ্গে গোপাকে খুব সাবধানে চলাফেরার কথা বলেছেন। মনে মনে গোপা আরও উত্তেজিত, মা খবরটা পেলে কত খুশি হবে। একথাটা ভাবলেই সাময়িকভাবে তার দুশ্চিন্তা উধাও হয়ে যাচ্ছিল।

কলকাতা যত এগিয়ে আসছিল গোপার ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা তত বাড়ছিল। সকালবেলার লোকাল ট্রেন। প্রথমদিকটায় ফাঁকাই ছিল। এখন ভর্তি হয়ে গেছে। চারপাশে গমগম করছে নানা ধরনের মানুষের গলা। গোপা আড়চোখে পরিমলকে দেখল। নির্বিকার মুখে বসে আছে বাইরের দিকে তাকিয়ে। ছেলেদের এই একটা গুণ ভগবান দিয়েছেন। ভেতরের আবেগ, উত্তেজনা, অস্বস্তি সাময়িক লুকিয়ে অদ্ভুত স্বাভাবিক মুখে চলাফেরা করতে পারে।

হাওড়া থেকে বাসে বাড়ি পৌঁছতে ঘণ্টাখানেক লাগল। কলকাতার রাস্তার যানজট গোপাকে পুরোনো স্মৃতি মনে করিয়ে দিচ্ছিল। এই ক-দিনেই মনে হচ্ছে

কলকাতা থেকে কত যুগ যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল। ওখানের খোলা আবহাওয়ায় নিজেকে ভীষণ রকম মুক্ত মনে হলেও এখন মনে হচ্ছে নিজের জায়গায় ফিরে এল। হঠাৎ করে ওদের দুজনকে দেখে গোপার মা ভীষণ অবাক। গোপা দেখল মায়ের চেহারাটা এ-কদিনেই বেশ খারাপ হয়ে গেছে। ঘরদোরের অবস্থাও কেমন অগোছালো। এত অপরিষ্কার তাদের ঘর কখনও থাকে না। গোপা বুঝল তার অনুপস্থিতির ধাক্কাটা মা এখনও মেনে নিতে পারেননি। মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। গোপার নিজেকে ভীষণ অসহায় লাগে।

খাওয়া-দাওয়ার পর গোপার মা নিজেই কথা তুললেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন মেয়ে কিছু বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারছে না। পরিমল পাশের ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিল। এই সময় মেয়েকে ধরলেন গোপার মা। আস্তে আস্তে সব কথাই মাকে বলল গোপা। ভৈরবী মায়ের কথা, বিকাশভাই-এর কথা, আশ্রমের কথা থেকে শুরু করে লালমোহনবাবুর প্রেসে পরিমলের কাজ করা পর্যন্ত সব। কিন্তু যে-দুটি খবর দেওয়ার জন্য এখানে আসা গোপা সেখানে এসে থেমে গেল। গোপার মা মন দিয়ে মেয়ের কথা শুনছিলেন। মেয়েকে থামতে দেখে তাকালেন তিনি। গোপা বুঝতে পারছিল না কোন্ কথাটা আগে বলবে। শেষ পর্যন্ত খুশির খবরটাই বলে ফেলল। মেয়ে মা হতে চলেছে জেনে গোপার মা যেন সব ভুলে গেলেন। শিশুর মত হইচই করতে শুরু করলেন। গোপা মায়ের কাণ্ড দেখে হতভম্ব। অনেক কষ্টে মাকে সামলালো সে। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন গোপার মা। মিষ্টি-মুখ করাবেন বলে যেই আবার উঠতে গেলেন মাকে হাত ধরে টেনে বসালো গোপা। মেয়েব মুখ দেখে কিছু যেন আন্দাজ করলেন তিনি। গোপা মুখ নিচু করে বসেছিল। মেয়েব মুখ তুলে ধরে সরাসরি জানতে চাইলেন কি ব্যাপার। গোপা আর পারল না, মায়ের কাঁধে মাথা রেখে কেঁদে ফেলল সে। তারপব এক এক করে বলে গেল সব কথা। ব্যাঙ্ক লোন পেতে গেলে যে এবাড়ি বন্ধক দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই একথা অনেক কষ্টে মাকে বলল গোপা। সব শুনে চুপ করে বসে রইলেন গোপার মা। যে ঘরে এখন পরিমল শুয়ে আছে সেটাই ছিল তাঁর ছেলের ঘর। একবার সেদিকে তাকালেন। তারপর মন শক্ত করলেন। স্বামীকে-ছেলেকে হারিয়ে এখন এই মেয়েই তাঁর একমাত্র সম্বল। আজ তাঁর স্বামী অথবা ছেলে বেঁচে থাকলে মেয়ের এরকম বিপদের দিনে অবশ্যই পাশে দাঁড়াতেন। বাড়ি তাঁর নিজের নামে হলেও, শেষ অবধি এ বাড়ি তো গোপারই প্রাপ্য। তিনি আর কটাদিনই বা বাঁচবেন? এ বাড়ি আগলে বসে থেকে তাই আর লাভ কি। বরং মেয়েটাকে থিতু দেখে গেলে তিনি শান্তিতে মরতে পারবেন। তাছাড়া বন্ধক-ই তো রাখা, এমন তো নয় চিরকালের জন্য এ বাড়ি হাতছাড়া হয়ে যাবে। মেয়ে যখন কিছুতেই আর শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবে না, তখন এছাড়া আর উপায়ই বা কি? বিশেষত এবার সন্তান আসছে, তার ভবিষ্যতের একটা ব্যবস্থা তো এখন থেকেই করে রাখতে হবে।

মেয়ের মাথায় হাত বোলালেন তিনি। এতক্ষণ নিজের মনের সঙ্গেই কথা বলছিলেন। মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখলেন সে তেমনিভাবে কোলে মাথা রেখে বসে আছে। যেন সেই ছোট্টবেলার গোপা। বাবা বা দাদার কাছে বকুনি খেলেই ছুটে চলে আসত মায়ের কাছে। তারপর কোলে মাথা রেখে অভিমান করে শুয়ে থাকত। মেয়ের

এখনকার সব কাজকর্ম সমর্থন না করলেও কেমন যেন মায়া হল তাঁর। মুখ তুলল গোপা। গোপার মা বললেন, 'এত চিন্তা করছিস কেন? এ বাড়ি তো তোরও। সুতরাং প্রয়োজন হলে তাকে কাজে লাগাতেই পারিস। এতে এত ভেঙে পড়ার কি হল?'

গোপা মাথা নাড়ে, 'তুমি বুঝতে পারছ না মা, হতে পারে এ বাড়ি আমারও, কিন্তু কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে বল তো এর প্রতিটি কোণে। তাছাড়া বাবা আর দাদাকে তো এখানেই অনুভব করা যায়, তাই না? সেই বাড়ি বন্ধক রাখা মানে তো, যতদিন না টাকা শোধ হচ্ছে, ততদিন অন্য কারও দখলে চলে যাওয়া। তুমি বুঝতে পারছ মা, এ বাড়ি আমাদের একেবারে খালি করে দিতে হবে?'

'সে তো হবেই। কিন্তু পরিমল ব্যবসাটা ঠিকমত দাঁড় করাতে পারলে এ বাড়ি তো আবার ফেরতও পাওয়া যাবে, তাই না? আমি তোকে বলছি শোন, আর দেরি করিস না। কাগজপত্র যা ব্যবস্থা করার তাই করতে বল গিয়ে পরিমলকে। আমি দেখি দলিলটা বের করি।'

গোপা মায়ের হাতটা টেনে ধরে, 'কিন্তু তুমি থাকবে কোথায় মা? আমাদের নিজেদেরই তো থাকার ঠিক নেই। আমরা যেখানে আছি, সেখানে তো তুমি থাকতে পারবে না। তাহলে থাকবে কোথায়?'

'তুই ভাবিস না। আমি একলা থাকি বলে দিদি প্রায়ই গোপালকে পাঠায় আমার খোঁজখবর নিতে। গোপাল তো প্রত্যেকবার এসে জোর-জবরদস্তি করে, মাসি আমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকবে চলো। মাও সারাদিন একা থাকে। তোমরা দুজনে একসঙ্গে থাকবে। এতদিন যাইনি, এবার ওখানে গিয়েই থাকব। দিদি ভারি খুশি হবে। তোর গোপালদাও।'

গোপা নিশ্চিন্ত বোধ করে। মাসির বাড়িতে মা থাকলে তার ভাবনা দূর হয়। আব গোপালদাও মাকে খুব ভালবাসে। এবার তাহলে পরিমলকে বলতে হয় কথাটা। সে উঠল। তারপর হঠাৎই নিচু হয়ে মাকে প্রণাম করল। গোপার মা প্রথমে অবাক হয়ে গেলেন। তারপর মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

মা কয়েকটা দিন থেকে যেতে বললেও, পরদিনই মগরা চলে এসেছিল ওরা। গোপার থাকার ইচ্ছে থাকলেও পরিমলের কথা ভেবেই চলে এসেছে। একেই মুখচোরা মানুষ পরিমল, বাড়িতেই কারোর সঙ্গে কথা বলত না, আর এখানে তো নতুন জায়গা। বিকাশভাই বেশিরভাগ সময়েই বাইরে বাইরে ঘোরেন, দেখাই পাওয়া যায় না তার। ভৈরবী মায়ের সঙ্গে পরিমল নিজে থেকে কথা বলবে ভাবাই যায় না। নিজের কোনও সমস্যার কথাই মুখ ফুটে বলার লোক নয় পরিমল। বেশির ভাগ সময় গোপাকেই সব কিছু বুঝে নিতে হয়। এমন মানুষকে একা ছেড়ে রাখতে ভরসা পায় না গোপা। তাই মাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে চলে এসেছিল। মাও আর জোর করেননি। মাকে যত দেখছে তত অবাক হচ্ছে গোপা। এত মনের জোর মা পায় কোথা থেকে! একের পর এক দুর্ঘটনা যেন আমূল পালটে দিয়েছে মানুষটাকে। যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট নিজের ভেতরে চেপে রাখার অদ্ভুত এক ক্ষমতা তৈরি হয়েছে মায়ের। অথচ বাবা যতদিন ছিলেন এই মা-ই ছিলেন সম্পূর্ণ অন্যরকম। কথায় কথায় বাবার ওপর রাগ, অভিমান কবতেন। সংসারের খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয়ে বাবাব ওপর নির্ভব করে থাকতেন। বাবাও কখনও বাগ করতেন না। এখন

গোপা বোঝে বাবা কতকটা মাকে প্রশ্রয়ই দিতেন। এবং ওই রাগ-অভিমানগুলো নীরবে উপভোগ করতেন। কত মধুর সম্পর্ক ছিল ওঁদের। বাবা থাকাকালীন কখনও কোনও বিষয়ে মাথা ঘামাতে হয়নি মাকে। দাদাটাও ছিল এক ধাতের। বাবার মত। দিনরাত মূর্তি গড়া নিয়ে মেতে থাকলেও মাকে সবসময় আগলে রাখত। গোপার দিকেও নজর থাকত দাদার। সামান্য একটা কিছু মুখ-ফস্‌কে বললেও মনে রাখত দাদা। ঠিক সেটি এনে হাজির করত। অল্প দিনের ব্যবধানে দু-দুজন প্রিয় মানুষকে হারিয়ে মায়ের কাছে পৃথিবীটাই অন্যরকম হয়ে গেছে। তার ওপর গোপার বিয়েটাও সুখের হল না। শেষ জীবনটা যে এরকম কাটবে মা বোধহয় তা স্বপ্নেও ভাবেননি।

সেদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর গোপা মায়ের কাছে শুয়েছিল। দলিলটা সন্ধেবেলাতেই পরিমলের হাতে তুলে দিয়েছিল মা। রাতে শোওয়ার পরে গোপাকে ফিসফিস করে বলছিলেন, 'ছেলেটাকে এত বড় একটা ঝুঁকির মধ্যে *ঠেলে* দিচ্ছিস, ও পারবে তো সামলাতে?'

গোপা অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়েছিল, '*ঠেলে* দিচ্ছিস মানে? আমি ওকে *ঠেলে* দিচ্ছি এটা তোমার মনে হল কেন?'

'কি জানি বাবা, বুঝতে পারি না। আসলে পরিমল যে একা একা কিছু করতে পারে, এটা আমি ভাবতেই পারি না। এতগুলো টাকার দেনা ঘাড়ে নিয়ে ব্যবসা করতে নামবে—তাও আবার কোনও অভিজ্ঞতা নেই—ও সব পারবে?'

গোপার মায়ের চিন্তা যাচ্ছিল না। গোপা একটু উষ্ণ গলাতেই বলেছিল, চিরকালই যদি পারবে না পারবে না করে বসে থাকে হাত গুটিয়ে, তাহলে চলবে কি করে মা? বিয়ে করেছে যখন তখন কোনও না কোনও দিন তো কিছু পারতে হবেই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মা একটা অবধারিত প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'বাড়ি বন্ধক রেখে যা টাকা পাবে তা দিয়ে মেশিনপত্র কিনে হাতে কিছু থাকবে? ব্যবসা করতে হলে তো আগে একটা দোকানঘর চাই। সে জায়গা পাবে কোথায়? এখন তো শুনেছি সেসবের জন্য অনেক টাকা সেলামি দিতে হয়।'

এ-বিষয়টা নিয়ে পরিমলের সঙ্গে গোপার আগেই আলোচনা হয়েছিল। মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তেও এসেছিল তারা। যদিও গোপার প্রথমে সায় ছিল না। পরে বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছিল। বাগবাজারের পুরোনো বাড়ি যেহেতু পতিতপাবন রায় কিছুতেই হাতছাড়া করবেন না, সেহেতু বাগবাজারের কেনা নতুন বাড়িটার একতলার একটা ঘর পরিমল ভাড়া হিসেবে নিতে চায়। এতে আর যাই হোক সেলামির টাকাটা বাঁচবে। যদিও এর জন্যে পল্লবী, প্রবাল, বনলতা, পতিতপাবন প্রত্যেকের অনুমতি চায়। লোনের মোটামুটি একটা ব্যবস্থা হয়ে গেলে পরিমল এ ব্যাপারে বাবার সঙ্গে কথা বলতে যাবে এমনও ঠিক হয়ে আছে। মাকে সেকথাই জানিয়েছিল গোপা। যদিও মায়ের একেবারেই পছন্দ হয়নি ব্যাপারটা। বিরক্ত গলায় বলেছিলেন, 'যে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিস, সে বাড়ির সঙ্গে যদি আর কোনও সম্পর্কই রাখবি না ঠিক করে থাকিস, তাহলে সেখানেই ওকে আবার পাঠাচ্ছিস কেন? ও বাড়িটা ছাড়া কি আর কোথাও প্রেস করা যেত না?'

গোপা মাকে বুঝিয়ে বলেছিল সেলামির কথাটা। যদিও মা বুঝতে চাননি। গোপা

তারপর বলেছিল, 'শুধু তাই নয়, এতে আমার অন্য একটা উদ্দেশ্যও কাজ করছে বলতে পারো।'

মা অবাক গলায় বলেছিলেন, 'উদ্দেশ্য! তার মানে?'

হালকা গলায় গোপা বলেছিল, 'আসলে কি জানো মা—অন্যায় তো আমরা কিছু করিনি, অন্যায় ওঁরা করেছেন। সুতরাং আমরা সব অধিকার থেকে কেন বঞ্চিত হব বলতে পারো?'

'তা এভাবে তুই তোদের কি অধিকার আদায় করবি? শ্বশুরের বাড়ি ভাড়া নিয়ে?'

'ঠিক তাই। ভাড়া নিয়েই করব। এটুকু তো অন্তত বুঝিয়ে দিতে পারব আমরা কারও দয়ার দানের ওপর নির্ভর করছি না। এর বেশি এই মুহূর্তে কিছু করার ক্ষমতা আমাদের নেই। এতে পতিতপাবন রায়ের যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ, সেটা অন্তত একটু শান্ত থাকবে। পাশাপাশি ও আত্মসম্মান নিয়ে কাজও করতে পারবে। আর এভাবে ও-বাড়ির সঙ্গে আমাদের একটা যোগাযোগও থেকে যাচ্ছে।' গোপা ব্যাখ্যা করে।

মা বিরক্ত গলায় বলেছিলেন, 'তোর কথা আমি কিছুই বুঝি না। যোগাযোগ রাখাই যদি তোর উদ্দেশ্য হবে, তাহলে ও বাড়ি ছাড়তে গেলি কেন?'

অন্ধকার ঘরে গোপা উঠে বসেছিল খাটের ওপর। তারপর আস্তে আস্তে বলেছিল, 'বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছি মা—ওদের জুলুম সহ্য করতে না পেরে। তাই বলে আমাদের সব অধিকার ছেড়ে দিলে চলবে কেমন করে? বিশেষ করে আমাকে তো ও-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেই হবে মা। নইলে দাদার মৃত্যুরহস্য জানতে পারব কি করে?'

ঠাণ্ডা গলায় কথাগুলো শেষ করতেই গোপার মা শিউরে উঠেছিলেন, 'তুই এখনও ওসব কথা ভাবিস নাকি?'

'হ্যাঁ মা, ভাবি। ভাবতেই হয়। সময় লাগলেও এ রহস্য আমি খুঁজে বের করবই। বাড়ির ভেতরে না থেকে হোক, বাড়ির বাইরে থেকেই করব।' শান্ত গলায় কথাগুলো বলে শুয়ে পড়েছিল গোপা।

দুপুরবেলা শুয়ে শুয়ে কয়েকদিন আগের কথাগুলো ভাবছিল গোপা। একা থাকলেই এসব সাত-পাঁচ ভাবনা আসে। তবে শরীরের মধ্যে অন্য একটা প্রাণের উপস্থিতি তাকে মাঝে মাঝে অন্য জগতে নিয়ে যায়। নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখে সে। দুর্লভ কিছু পেতে সে চায় না, শুধু সহজ সুখে স্বামী-সন্তানকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়।

॥ ৪ ॥

লালমোহনবাবুকে বলে পরিমল একটা দিন ছুটি নিয়ে চলে এল তার নিজের বাড়িতে, যদিও সে জানে এ বাড়িতে তার আর কোনও অধিকার নেই। কারণ একবার যে এ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায় পতিতপাবন রায় তাকে কোনদিনও ক্ষমা করেন না, যেমন করেননি তার ছোটভাই প্রবালকে। ছুটির দিন পতিতপাবন অনেক সময়েই বাইরে যান বলে পরিমল একটা কাজের দিনই বেছে নিয়েছিল বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্য।

খুব ভোরে মগরা থেকে বেরিয়ে সে যখন বাড়ি পৌঁছল তখন সবে সাতটা বাজে। গুরুপদ কোথাও বেরোচ্ছিল, তাকে ঢুকতে দেখে সে একেবারে অবাক। একগাল হেসে

বলে উঠল, 'আরে বড়দাদাবাবু যে! সক্কাল সক্কাল আজ তোমার মুখ দেখতে পেলাম, আমার যে কি সৌভাগ্য!'

পরিমল হেসে বলে, 'আমাব মত দুর্ভাগার মুখ দেখাটাকে তুমি সৌভাগ্য বলছ! সত্যি তুমি পারো গুরুপদদা।'

গুরুপদ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'ছি ছি ছি, এ তুমি কি বলছ দাদাবাবু! ছোট্টবেলাটি থেকে তোমাদের কোলেপিঠে করে মানুষ করে তুলেছি, আজ আমাকে এসব দেখতে হচ্ছে। তবে আমরা তো মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, আমার কি মনে হয় জানো— এ সবই ভাগ্যের পরীক্ষা। একদিন দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পরিমল হাসে। তারপর ভেতরের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বাবার কাছে কি কোনও লোক আছেন? তাহলে আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।'

গুরুপদ মাথা নেড়ে বলে, 'বড়বাবুর কাছে কেউ নেই এখন। তুমি যাও ভেতরে। কথা বলো গিয়ে।

পরিমল তবুও একটু ইতস্তত করে। গুরুপদ সেই দেখে বলে, 'কি হল বড়দাদাবাবু, কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ, মানে, তুমি যাও, আগে গিয়ে বাবাকে একটু খবর দাও আমি এসেছি বলে— তারপর আমি যাচ্ছি।' পরিমল বলে।

'হায় রে আমার পোড়াকপাল! আরও কত কি দেখব! ছেলে যাবে বাবার সঙ্গে দেখা করতে তার জন্য আগে খবর দিতে হবে? ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। তুমি ভেতবে এসে বসো।'

গুরুপদ ভেতরে চলে গেলে পরিমল যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনই দাঁড়িয়ে রইল। চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল সে। এখনও অন্য কেউ দেখতে পায়নি, নাহলে এতক্ষণে ওপরে খবর চলে যেত। অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল পরিমল। পেছন থেকে বাবার গলা পেয়ে চমকে ওঠে, 'কতক্ষণ এসেছ?'

তাড়াতাড়ি ঘুরে দেখে গুরুপদদার পেছন পেছন পতিতপাবন রায় এসে দাঁড়িয়েছেন। পরিমল এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করে, 'এই তো, এক্ষুনি।'

'এসো, ভেতরে এসো—', পতিতপাবন ছেলেকে নিয়ে যান নিজের ঘরে।

বাবার ঘরে ঢুকে পরিমল বসে চেয়াবে। অদ্ভুত একটা উত্তেজনা কাজ করছে ভেতরে ভেতরে। পতিতপাবন ছেলের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বলো কি ব্যাপার?'

পরিমল ইতস্তত গলায় বলে, 'ইয়ে, মানে, আপনাকে বিরক্ত করলাম না তো? আমার উচিত ছিল খবর দিয়ে আসা— কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠল না।'

'হয়নি যখন ছেড়ে দাও। তবে এই সক্কালবেলাতেই চলে এসেছ যখন তখন ব্যাপারটা নিশ্চয়ই জরুরি কিছু হবে বলে আন্দাজ করছি।' পতিতপাবনের গলায় সূক্ষ্ম খোঁচা।

খোঁচাটা ধরতে পারে পরিমল। সে বলে, 'হ্যাঁ, সকালেই আসতে হল তার কারণ, বেলা হয়ে গেলে তো আপনি ব্যস্ত হয়ে যাবেন। আপনাকে ফাঁকা পাওয়া যাবে না।'

'ঠিক আছে, বলো, কি বলতে এসেছ?' পতিত চেয়ারে হেলান দেন।

পরিমল মাথা নিচু করে। তারপর ধীরে ধীরে বলে, 'বাবা, আপনাকে তো আগেই ওই প্রেসের ব্যাপারে কিছু বলেছিলাম। এখন ব্যাপারটা অনেকদূর এগিয়েছে। ব্যাঙ্ক থেকে লোনও পাওয়া যাবে। এখন শুধু একটা জায়গাব দরকার যেখানে প্রেসের কাজ হবে। আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে বাগবাজারের নতুন বাড়ির একতলার একটা ঘর আমি ভাড়া নিতে চাই যেখানে প্রেস করব।'

পতিত এক দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়েছিলেন, এবার বললেন, 'হ্যাঁ, ঘর তো ভাড়া নিতেই পারো। কিন্তু ও-বাড়ি তো শুধু আমার একার নয়। তোমাকে আর সবার অনুমতি নিতে হবে। তাদের কারও আপত্তি না থাকলে আমার আর আপত্তি কীসের? তবে প্রত্যেকের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি চাই।'

'প্রবালের সঙ্গে আমার আগেই কথা হয়েছে বাবা। শুধু ও বাড়িই নয়—প্রবাল আমাকে বলেছে, আপনার কোনও সম্পত্তির ওপরেই কোনও দাবি বা অধিকার সে চায় না।' পরিমল ইতস্তত গলায় বলে।

'ও—ওর মত ছেলের কাছে অবশ্য এই উত্তরটাই আশা করেছিলাম। তাহলেও "আপত্তি নেই" একথা শুধু মুখে বললেই তো চলবে না। ও যা ছেলে, পরে আবার কোন্‌দিক থেকে আমাকে আক্রমণ করে বসবে, তার কি ভরসা আছে? ওকেও লিখে দিতে হবে।' পতিতপাবন গম্ভীর গলায় বলেন।

পরিমল মাথা নাড়ে, 'ঠিক আছে, আমি প্রবালকে বলব। তবে আপনার কি অনুমতি আছে বাবা?'

পতিতপাবন সামান্য চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, 'সাত-পাঁচ না ভেবে ব্যবসায় নেমে পড়লেই তো হল না। বাড়িটা তো পড়েই আছে। শিবনাথকে আমি বলেইছিলাম ভাড়াটে দেখার জন্য। সে জায়গায় তুমি ভাড়া নিলে আমার আপত্তি থাকার কারণ কি?'

'তাহলে বাবা, আমি কি একবার মা আর পল্লবীর সঙ্গে দেখা করে আসতে পারি? ওদের অনুমতি রয়েছে কিনা সেটা জানাও তো জরুরি।'

'অবশ্যই জানতে পারো। এতে আমাকে জিজ্ঞাসা করার কিছু নেই। ওদের প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলাটা তোমার জরুরি।'

'একটা কথা বাবা, আমি তো ঘরটা ভাড়াই নিতে চাইছি, তাহলেও কি প্রত্যেকেব সঙ্গে কথা বলাটা জরুরি?'

গম্ভীর গলায় পতিত বলেন, 'অবশ্যই জরুরি। তবে কেন জরুরি তা আমি এখনই বলব না। সময়মত জানতে পারবে। তবে হ্যাঁ, কি কথা হল না হল, যাবার সময় তা আমাকে জানিয়ে যাবে।'

পরিমল মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে। তারপর উঠে বেরোতে যায়, পতিতপাবন পেছন থেকে ডাকেন, 'শোনো, আমি খবর দিয়ে দিচ্ছি, তুমি এখান থেকে খেয়ে যাবে।'

পরিমল কিছু বলার আগেই পতিত বলে ওঠেন, 'যাও ওপরে যাও।'

মায়ের ঘরে যাবার আগে কি মনে করে পরিমল প্রথমে পল্লবীর ঘরের দিকে এগোল। একটা মাত্র বোন তার। কিন্তু বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার মনটা না বাড়ায়

বোনকে সবসময় সেই ছোট্টটিই ভেবে এসেছে পরিমল। ডাঃ চ্যাটার্জীর মেন্টাল হোম থেকে ফিরে আসার পর পল্লবী এখন অনেকটাই সুস্থ। যদিও এখনো সেভাবে স্বাভাবিক কাজকর্ম তাকে করতে দেওয়া হয় না, একা কোথাও বেরোতে দেওয়া হয় না, সারাটা দিন বাড়ির মধ্যেই কাটায় পল্লবী। বোনের জন্য মায়া লাগলেও পরিমলের কিছু করার নেই। বোনেব ব্যাপারে মায়ের সিদ্ধান্তই শেষ কথা। অনেক সময় বাবাকেও এ ব্যাপারে আপোস করতে দেখেছে পরিমল।

পল্লবীর ঘরে ঢুকে দেখল পরিমল, সে মন দিয়ে একটা বই পড়ছে। দাদাকে প্রথমে দেখতে পায়নি সে, পরিমল আলতো গলায় ডাকল, 'পল্লবী!'

চমকে তাকাল পল্লবী দাদার দিকে। তারপর ছুটে এসে দাদাকে জড়িয়ে ধরল সে, 'দাদা, তুমি! কখন এলে?'

'এই তো, একটু আগে। নিচে বাবার সঙ্গে দেখা করার পর সোজা তোর কাছে চলে এলাম। কেমন আছিস বল?' পরিমল বোনের দিকে তাকায়।

পল্লবীর মুখ মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে যায়, 'আমি কেমন আছি! কেন, তোরা কেউ সে খবর রাখিস নাকি? আজ হঠাৎ জিজ্ঞেস করছিস?'

পরিমল এগিয়ে আসে বোনের কাছে, তারপর নরম গলায় বলে, 'রাগ করছিস আমার ওপর? যদিও তোর কথাগুলো একেবারেই সত্যি, কিন্তু পল্লবী তুই তো জানিস আমার অবস্থা, আমার ওপর রাগ করিস না বোন।'

দাদার এরকম গলা শুনে পল্লবী অবাক হযে যায়। কাছে এসে বলে, 'কি হয়েছে তোর দাদা? আমার কথা ছাড়, আমি তো এখানে খাঁচায় বন্দী পাখি, মাঝে মাঝে পাখা ঝাপটায়। খাঁচার জানলা দিয়ে আকাশ দেখি আর আমার বরাদ্দ দানাপানি খাই। আমার জীবনে এছাড়া আর কি আছে বল! কিন্তু তোর গলা শুনে মনে হচ্ছে তুই ভাল নেই। কি হয়েছে আমাকে বল—বউদি কেমন আছে?'

পরিমল ঘরের একপাশে রাখা চেয়ারটায় গিয়ে বসে। তারপর ক্লান্ত গলায় বোনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বউদি ভাল আছে। কিন্তু আজ আমি তোর কাছে একটা দরকারে এসেছি পল্লবী।'

পল্লবী অবাক হয়ে তাকায, 'দরকারে! আমার কাছে?' তারপর হেসে ফেলে, 'আমি কারও কোনও দরকারে লাগতে পারি ভেবেই আমার ভাল লাগছে। বল কি দরকার?'

'বাগবাজারে বাবা তোর নামে একটা বাড়ি কিনেছেন, মানে, মালিকানা তোর। কিন্তু দেখাশোনা করাব দায়িত্ব বাবার। আমি ওই বাড়িটার ব্যাপারেই তোর সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।'

'কিসব বলছিস তুই দাদা?' পল্লবী অবাক হয়ে তাকায়, 'বাগবাজারে বাবা আমার নামে বাড়ি কিনেছেন? কই, আমি তো এসব কিছু জানতাম না। আজ প্রথম তোমার কাছে শুনলাম।'

'হ্যাঁ, এটা সত্যি। এখন তোকে যেজন্য বলা, ওই বাড়ির নিচের তলার একটা ঘরে আমি প্রেস করার কথা ভাবছি। বাবার কাছে সে ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছিলাম। একতলার একটা ঘর আমি ভাড়া নিতে চাই। বাবা বললেন এ ব্যাপারে তোদের সবার

সঙ্গে কথা বলতে। মানে তোর সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে—।' পরিমল থেমে যায়।

'আমাতে কি করতে হবে?' পল্লবী প্রশ্ন করে।

'প্রথম কথা, তোর কি এব্যাপারে কোনও আপত্তি আছে? তাহলে সেটা আগে জানা।' পরিমল বলে।

'আপত্তি! আপত্তি কেন থাকতে যাবে? ওই বাড়িব কথা তো আমি জানতামই না। তুই প্রেস করলে আমার আপত্তির কি আছে?'

'উঁহু, সেটা শুধু মুখে বললে হবে না। তোর যে আপত্তি নেই, সেটা আমাকে লিখিত দিতে হবে— বাবার সেইরকমই মত।'

'বুঝেছি। পরে যাতে কেউ অস্বীকার করতে না পারে। উঃ, লোকটাকে যত দেখছি তত অবাক হচ্ছি। নিজের ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত বিশ্বাস করে না!' পল্লবী মুখ বেঁকায়।

পরিমল অবাক হয়ে বোনের দিকে তাকায়। এ কোন্ পল্লবীকে দেখছে সে? এই গলায় তাকে কথা বলতে আগে কখনও শোনেনি সে। বোনের দিকে তাকিয়ে পরিমল বলল, 'ছিঃ পল্লবী, এভাবে বলিস না। তোর গুরুজন হয়।'

'রাখো তো!' ঝাঁঝিয়ে ওঠে পল্লবী, 'তুমি জানো না লোকটাকে। দাম্ভিক, অহঙ্কারী একটা লোক। শুধু ওই একজনের জন্য সবাই একে একে ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আর আমি আরও একা হয়ে যাচ্ছি।'

পরিমল উঠে এসে পল্লবীর পাশে বসে। তারপর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে, 'তোর খুব কষ্ট হয় না-রে একা থাকতে?'

'হ্যাঁ, ভীষণ। মা তো সারাদিন ওই ঘরে শুয়ে থাকে। আর যে যার মত কাজে ব্যস্ত। দিনের পর দিন আমার যে কী ভাবে কাটে!' পল্লবী চুপ করে।

পরিমল কি বলবে ভেবে পায় না। এইসময় হঠাৎ পল্লবী বলে ওঠে, 'আচ্ছা দাদা, একটা কাজ করলে হয় না? তুমি ও বাড়িতে প্রেস করো, আমারও এভাবে বসে থাকতে ভাল লাগছে না, আমিও তোমার ব্যবসায় জয়েন করি।'

'তুই! তুই প্রেসের ব্যবসায় কি করবি?'

'যা হোক কিছু। আমি যে কোনও ধরনের কাজ করতে চাই। প্লীজ দাদা, তুমি আপত্তি কোরো না।' পল্লবী অনুনয় করে।

'আমি তোর অবস্থাটা বুঝতে পারছি বোন। কিন্তু তুই বুঝতে পারছিস না, প্রেসের কাজে প্রচুর খাটনি। তোর পক্ষে সেসব করা সম্ভব হবে না।' পরিমল বোনকে বোঝাবার চেষ্টা করে।'

'তাহলে কি এভাবেই আমার জীবনটা কাটবে?' পল্লবী মুষড়ে পড়ে।

'তা কেন!' পরিমল সান্ত্বনা দেয় বোনকে, 'তুই আবার পড়াশোনাটা শুরু কর না। কতজন তো বাড়িতে বসে পড়াশোনা করে বি.এ., এম.এ. পাশ করছে।'

পল্লবীর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, 'সত্যি বলছিস দাদা? এই বয়সে আবার পড়াশোনা শুরু করা যায়? আমি পারব পরীক্ষা দিতে?'

'কেন পারবি না! তুই শিবনাথ কাকাকে বলবি, তোকে সব খবরাখবর এনে দেবে।' পরিমল বলে।

পল্লবী সজোরে মাথা নাড়ে, 'না দাদা, ওসব লোককে আমি একেবারে বিশ্বাস করি

না। যদি কিছু ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে তুমিই করো। আমি ভাল করেই জানি এ বাড়িতে কেউ আমাকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। মাথা ঘামালে আমাকে এভাবে পড়ে থাকতে হত না। আমার জন্যে যদি কিছুমাত্র করার থাকে তাহলে তুমি আর ছোড়দাই যে করবে তা আমি জানি। আচ্ছা, ছোড়দা আমায় বলেছিল, দরকার হলে ওকে ফোন করতে। ফোন করব ছোড়দাকে?'

পরিমল মাথা নাড়ে, 'করতে পারিস। তবে প্রবাল যেভাবে ওর অফিস নিয়ে ব্যস্ত, ও কি এসব করবার সময় পাবে! আচ্ছা ঠিক আছে, তোকে এত চিন্তা করতে হবে না। আমিই সব খোঁজখবর নিয়ে তোকে জানিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে। তবে তুমি তোমার ব্যবসার ব্যাপারটাও মাথায় রেখো। ওখানে যদি আমার সুবিধেমত কোনও কাজ থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে জানিয়ো।' পল্লবী দাদাকে বলে।

পরিমল উঠে দাঁড়ায়। তারপর হেসে মাথা নাড়ে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, মনে রাখব। আমি এখন উঠি। মায়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তুই তাহলে বাবার কাছে একটা কাগজে লিখে দিস, আমি ওই বাড়িতে প্রেস করলে তোর কোনও আপত্তি নেই। ভুলিস না।'

পল্লবী ঘাড় নাড়ে, 'তোমার কোনও চিন্তা নেই—আমি এখনই লিখে দিয়ে দিচ্ছি।'

পল্লবীর ঘর থেকে বেরিয়ে পরিমল পা বাড়াল মায়ের ঘরের দিকে। এতদিন পর মাকে দেখবে, পরিমলের ভেতরে অদ্ভুত একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। এতক্ষণে মা নিশ্চয় তার আসার খবর পেয়ে গেছে। তারপরেও যখন নিজে থেকে দেখা করতে আসেনি, তখন খুব একটা ভাল ব্যবহার পাবে বলে সে আশা করে না। পায়ে পায়ে মায়ের ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল পরিমল। বনলতা খাটেই বসেছিলেন। ঝরনা বোধহয় কোনও কাজে এসেছিল ওই ঘরে, পরিমলকে দেখেই গলা তুলল, 'ওমা বড়দাদাবাবু যে! ও বড়মা দ্যাখো গো, কে এসেছে!'

ঝরনার কথায় বনলতা বিরক্ত গলায় বলে ওঠেন, 'আঃ, চেঁচাচ্ছিস কেন অমন হেঁড়ে গলায়? এসেছে সে তো দেখতেই পাচ্ছি, তুই যা, নিজের কাজে যা এখন।'

ঝরনা বনলতার দিকে একবার তাকিয়ে বেরিয়ে যায় পরিমলকে পাশ কাটিয়ে। পরিমল এগিয়ে যায় মায়ের খাটের কাছে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলে বনলতা বলে ওঠেন, 'থাক, থাক।'

পরিমল বলে, 'কেমন আছ মা?'

বনলতা ঘাড় নাড়েন, 'ভালই আছি। খামোখা খারাপ থাকব কেন? আমি বোকাসোকা মানুষ। তেমন লেখাপড়া শিখিনি—তাই তোমার বাবা দয়া করে যেমন রেখেছেন তেমনই আছি।'

পরিমল কি উত্তর করবে ভেবে পায় না। বনলতা নিজেই বলে ওঠেন, 'তা হঠাৎ কি মনে করে?'

মায়ের এরকম কঠিন ব্যবহারে পরিমল মুষড়ে পড়লেও ধীরে ধীরে পুরো ব্যাপারটা বলে। বাগবাজারের বাড়ি ভাড়া নেওয়ার ব্যাপারে তাঁর কোনও আপত্তি আছে কিনা জানতে চাইলে, বনলতা কোনও ভূমিকা ছাড়াই স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তাঁর আপত্তি

আছে। পরিমল এমনটা আশা করেনি। সে অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বলে, 'তোমার... আপত্তি আছে মা?'

'হ্যাঁ, আছে। কেন, আপত্তি থাকতে পারে না বুঝি?'

'না, তা নয়। তবে তোমার এ ব্যাপারে আপত্তি থাকতে পাবে এটা আমি একেবারেই ভাবতে পারিনি, তাই—। আসলে প্রবাল, পল্লবী ওরা তো সবাই এককথায় রাজি হয়ে গেল। এমনকি বাবাও—।' পরিমল কথা শেষ করে না।

বনলতা বাঁকা হাসি হাসেন, 'ও, তাই ভেবে নিলে যে মাও এককথায় রাজি হয়ে যাবে, তাই না? না, আমি তোমাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি, এ ব্যাপারে আমার মত নেই।'

পরিমল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। বনলতা খানিকক্ষণ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন। তারপর বলেন, 'বেশ তো ছিলে, এ বাড়ি ছেড়ে যখন চলেই গিযেছ তখন এ বাড়ির সম্পত্তির ওপর আবার নজর কীসের? বাড়িব লোকেদেব সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারো, আবার প্রয়োজনের সময় ভাগ বসাতে এসেছ!'

মায়ের এরকম আক্রমণে পরিমল বিভ্রান্ত হয়ে যায। সে বলে, 'তুমি ভুল করছ মা। আমি কিন্তু কোনও অবস্থাতেই ওসব ভাগ-টাগ চাইতে আসিনি। আমার সে উদ্দেশ্যও নেই। আমি ভাড়াটে হিসেবে ওই বাড়ির একতলার একটা ঘর নিতে চাইছি প্রেসের কাজের জন্য। বাবার সঙ্গে আমার সেইরকমই কথা হয়েছে।'

বনলতা এবার একটু গলা নামান, 'সেজন্য নয়, আমার অন্য অসুবিধে আছে।'

'কি অসুবিধে? আমাকে সেটা বলো?'

'তোমাকে বলে কোনও লাভ নেই। তুমি সেসব বুঝবে না। নিজের বুদ্ধিতে তো কাজ করো না তুমি। আর এখন তো আরও আমাদের কথা শুনবে না। কিছু মনে কোবো না, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, যে ছেলেকে আমবা মানুষ করেছি, তুমি আব সে নেই। একেবারে পালটে গেছ।'

পরিমল অধৈর্য গলায় বলে ওঠে, 'তুমি এভাবে কথা বললে তো কোনও সমস্যাব সমাধান হবে না। আমার বিরুদ্ধে তোমার যদি কোনও অভিযোগ থেকে থাকে সেটা স্পষ্ট করে বলো।'

বনলতা ফুঁসে ওঠেন, 'এখনও স্পষ্ট করে বলতে হবে? তাহলে শোনো—স্পষ্ট কথাই বলছি। ছেলের বিয়ে দিয়ে লোকে যখন বাড়িতে বউ আনে, তখন সেই বউকে নিজেদের মত করে গড়ে-পিটে নিতে বাড়ির মেয়েরাই পারে। এসব ব্যাপারে ছেলেদেব মাথা ঘামাতে নেই। যারা ঘামায় তারা মেয়েলি পুরুষ। আজ পর্যন্ত দেখেছ, দোতলাব কোনও সাংসারিক সমস্যায় তোমার বাবাকে মাথা গলাতে?'

পরিমল এবার বলে, 'আমিও গলাতাম না মা। আমারও একটা রুচিবোধ আছে। তাছাড়া আমি বাড়িতে কতটুকু থাকতাম যে বাড়িব মেয়েলি ব্যাপারে মাথা গলাব? কিন্তু তোমরা যেটা করছিলে সেটাকে শুধু ওই মেয়েলি ব্যাপার বলে না।'

'তাহলে কি বলে?' বনলতা স্পষ্ট চোখে তাকান।

'এখন তো ওসব কথা বলে আর কোনও লাভ নেই মা। কেন এসব পুরোনো কথা তুলছ?'

বনলতা এবার গলা নামাল, 'আমি জানি বড়খোকা, তোবা অনেক লেখাপড়া

শিখেছিস। কথার জাদুতে তোদের সঙ্গে আমি পেরে উঠব না। কিন্তু বিয়ের পর থেকে এই সংসারটা সামলাচ্ছি। তোদের তিন ভাইবোনকে মানুষ করেছি। আমার তো সামান্য কিছু বলার থাকতে পারে।' বনলতার গলা ধরে আসে, 'দুদিন যার সঙ্গে ঘর করলি সে তোর এত আপন হয়ে গেল যে তার জন্য তুই বাড়ি-ঘর বাপ-মা আত্মীয়স্বজন ছেড়ে বেরিয়ে গেলি? একবারও তোর আমাদের জন্য কষ্ট হল না?'

পরিমল কি বলবে ভেবে পায় না। সে মাথা নিচু করে চেয়ারে বসে পড়ে। বনলতা চোখের জল মুছে আবার ফোঁস করে ওঠেন, 'তোর যদি আমাদের জন্য কষ্ট না হয়, আমরাই বা তাহলে কেন তোর কষ্টে মাথা ঘামাতে যাব বলতে পারিস? যে বাপকে তুচ্ছ করে তুই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলি সেই বাপই কিন্তু তোর বিপদের দিনে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। আজও সেই বাপই এককথায় তোকে বাড়ি ভাড়া দিতে রাজি হয়ে গেল। তুই এসবের কি দাম দিস? কোন্ মুখে আবার বড় বড় কথা বলিস?'

চুপচাপ মায়ের কথাগুলো শুনছিল পরিমল। এবার মুখ তুলল, 'ভেবেছিলাম আজকে আর কোনও অপ্রীতিকর কথা বলব না। কিন্তু তুমি আমায় বাধ্য করলে মা। শোনো, নিচু জাতের গরিবের মেয়ে বলে তুমি গোপাকে যতই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করো না কেন, গোপা কিন্তু কোনওদিন এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবেনি। সারাদিন বাড়িতে কি হত না হত, সে ব্যাপারেও ও কোনওদিন আমাকে কিছু বলত না। মুখ বুজে থাকত। কিন্তু আমি ওকে দেখে সবই বুঝতে পারতাম। শেষের দিকে তোমাদের অত্যাচারে আমিই বরং ওকে অনেকবার রাগ করে চলে যাবার কথা বলতাম। ও আমাকে নিষেধ করত। ধৈর্য ধরতে বলত।' একটানা কথাগুলো বলে পরিমল থামল।

বনলতা এবার ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, 'কি অত্যাচার করেছি আমরা তোর বউয়ের ওপর? বাড়িতে ঝি-চাকর ভর্তি, সারাদিন পটের বিবিটি সেজে বসে থাকত—খুব যে অত্যাচার অত্যাচার বলছিস, বল? কি অত্যাচার করেছি।' বনলতার গলা চড়ে যায়।

পরিমল এবার অসহায় বোধ করে। সে মাকে বলে, 'অত কথা আমি বলতে চাই না মা। আমার বলতে মোটেও ভাল লাগবে না। আর তোমারও সেসব শুনতে ভাল লাগবে না। সেসব বাদ দাও। ভাল করে ভেবে দেখলে নিজেরাই বুঝতে পারবে। আর সংসারের কাজকর্ম সে তো ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি, আমাদের বাড়িতে ঝি-চাকরেরাই বরাবর সংসারের কাজ করে। আসল কথাটা এবার তাহলে শোনো যে গোপা এত কিছুর পরেও কোনদিন এ বাড়ি ছেড়ে যাবার কথা আমাকে বলেনি, সেই গোপাই একদিন সন্ধেবেলা আমার কাছে কেঁদে ফেলেছিল। মুখ ফুটে না বললেও আমি বুঝতে পারছিলাম ও এই বাড়িতে আর এক মুহূর্ত থাকতে চায় না। এমন কথাও বলেছিল. ঘেন্নায় ওর গা রি-রি করছে। আমি আজও জানি না কেন ও সেকথা বলেছিল! কি এমন ঘটনা ঘটেছিল সেদিন?'

বনলতা ছেলের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকান, 'কি ঘটনা? কীসের কথা বলছিস তুই?'

পরিমল এবার স্পষ্ট গলায় বলে, 'সেটা তো আমিও জানি না মা। কি এমন দেখেছিল গোপা সেই সন্ধেয় যাতে ঘরের ভেতরে গিয়েও থরথর করে কাঁপছিল—কিছু বলতে পারছিল না? বলো মা, তুমি জানো? আমিও জানতে চাই। কেন গোপা অমন

করেছিল সেদিন?'

বনলতার মুখ নিমেষে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে যায়। ছেলের দিকে সরাসরি তাকাতে পারেন না তিনি। চোখের সামনে সেদিন সন্ধের ঘটনাটা ভেসে ওঠে তাঁর। আজ বুঝতে পারলেন, সেই সন্ধেয় শিবনাথকে তাঁর ঘরে গোপাই তাহলে দেখেছিল! অন্ধকারে বুঝতে না পারলেও শিবনাথও সেরকমই আন্দাজ করেছিল। কিন্তু বনলতা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঝোঁকেব মাথায় সেদিন যে কি কি করে বসেছিলেন তিনি, ভাবতেই চোখ বন্ধ হয়ে যায় তাঁর।

পরিমল আর কোনও কথা না বলে উঠে দাঁড়ায়, 'আমি আসছি মা। নিচে বাবাকে তোমার আপত্তির কথা জানিয়ে দিচ্ছি। আমারই দুর্ভাগ্য সব। সেই কারণেই এসব ঘটছে। তুমি ভেবো না। আমি আর তোমায় জোর করব না।' কথাগুলো বলে পরিমল ঘর থেকে বেবিয়ে যায়। বনলতা স্থাণুর মত বসে থাকেন বিছানায়।

মায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে ধীর-পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল পরিমল। উত্তেজনার মাথায় আজ অনেক কথা বলে ফেলেছে সে। মা যাই বলে থাকুক, এর আগে সে কখনও মার সঙ্গে এই গলায় কথা বলেনি। একটু খারাপ লাগলেও তার থেকে বেশি খারাপ লাগছিল বাড়িটা না পাওযার জন্য। পতিতপাবন বলেছিলেন যাবার আগে পল্লবী এবং বনলতার মতামত তাঁকে জানিয়ে যেতে। পরিমল সেই কারণেই বাবার ঘরের দিকে এগোল। কোর্টে বেরোনোর জন্য পতিতপাবন প্রায় তৈরি হয়ে গিয়েছিলেন। কাগজপত্র দেখে নিচ্ছিলেন, এইসময় পরিমল ঢুকল ঘরে। পতিত ছেলের দিকে তাকালেন, 'কি ব্যাপার? কথা হল মা আর বোনেব সঙ্গে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' পরিমল মাথা নাড়ে।

'কি বলল ওরা?'

'পল্লবীর কোনও আপত্তি নেই এ ব্যাপারে। ও তো খুবই উৎসাহী। কিন্তু মা—', পরিমল চুপ করে যায়।

'কি, রাজি নন, তাই তো?' পতিতপাবন মাথা নাড়েন, 'আমি সেইরকমই আশা করেছিলাম। তুমি ওঁকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলেছিলে?'

'হ্যাঁ বাবা, কিন্তু উনি সেসব শুনতে রাজি নন। বাড়ি ভাড়া দেবাব ব্যাপারে ওর মত নেই সেটাই জানিয়ে দিলেন।'

'তাহলে তো আমার কিছু বলার নেই পরিমল। প্রত্যেকের যদি মত না থাকে তাহলে আমার কিছু করার থাকছে না।' পতিতপাবন ঘড়ির দিকে তাকালেন।

পরিমল তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'আমি তাহলে এখন আসি বাবা আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে।' পরিমল এগোতে যায়।

পতিতপাবন পেছন থেকে ডাকেন, 'দাঁড়াও, বাগবাজারের বাড়িটা না পেলে অন্য ব্যবস্থা কি কববে সেসব কিছু ভেবে দেখেছ?'

'না, বাবা। আমার মাথায় অন্য কোনও ভাবনা ছিল না। তবে এবার নতুন করে আবার কিছু ভাবতে হবে। ও নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। আমি দেখছি কি করা যায়।' পরিমল ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

এইসময় হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামে ঝরনা। পরিমলকে বেরোতে দেখে বলে

ওঠে, 'বড়দাদাবাবু, একটু দাঁড়ান। যাবেন না। বডবাবুব ঘরে চলুন, দরকার আছে।' বলেই আর না দাঁডিযে ঝরনা পতিতেব ঘরে ঢুকে যায়।

পরিমল কি করবে বুঝতে না পেরে আবার বাবার ঘরে ঢোকে।

পতিতপাবন তাকান, 'কি হল?'

ঝরনা বলে, 'বড়বাবু, বড়মা বলে পাঠালেন বাগবাজারের বাড়ির ব্যাপারে আপনার যা মত তার সঙ্গে ওঁর কোনও আপত্তি নেই। আপনি যেরকম বলবেন সেইমতই উনি করবেন।'

পতিত ভুরু কুঁচকে ব্যাপারটা শোনেন। তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'শুনলে তো কথাটা। কনগ্র্যাচুলেশনস্। তুমি একটা অসাধ্যসাধন করলে। আমার তো ধাবণা ছিল এই বাধাটা তুমি টপকাতে পারবে না।'

পরিমল মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

পতিতপাবন ঝরনাব দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ঠিক আছে, তুই যা। বড়মাকে গিয়ে বল, বড়দাদাবাবু গিয়ে যা লেখাবার লিখিয়ে নিয়ে আসছে।'

ঝরনা মাথা নেড়ে বেরিযে যায়।

পতিত পরিমলকে বলেন, 'লেখাটা তুমিই তৈরি করে মাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ো। আর একটা কথা, কোন্ ঘরটা তোমার দরকার না দরকার সেটা একদিন ওখানে গিয়ে দেখে এসো, গুরুপদ তোমার সঙ্গে যাবে।'

পরিমল এবাব আমতা আমতা করে বলে, 'আজ্ঞে মানে—ভাড়া কত দিতে হবে, সেটা যদি বলেন।'

পতিত মুখ তোলেন, 'ভাড়া? ও হ্যাঁ, ভাড়া দিতে হবে বইকি। তুমি আগে ঘর পছন্দ করো, তাবপর দেখতে হবে কত ভাড়া ধার্য কবলে তোমারও অসুবিধে হবে না আব আমারও ক্ষতি হবে না। ওটা আমি তোমায় পরে জানিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে। আমি তাহলে লেখাটা তৈবি করে ওপরে মায়ের কাছে যাই?' পরিমল বাবাকে বলে।

'এসো।' পতিত ছেলের দিকে তাকান, 'আমার ভাবতে ভাল লাগছে এই প্রথম একটা দাযিত্বপূর্ণ কাজ তুমি শুরু করতে যাচ্ছ। যদিও এ ব্যাপারে আমার কোনও সম্যক ধ্যান ধারণা নেই। সেসব তুমি নিশ্চযই বুঝবে। শুধু আমার একটা অনুরোধ, এরকম একটা ব্যবসার সঙ্গে তুমি আমার নামটা কোনভাবেই জড়াবে না! আমি চাই না কেউ এ সম্বন্ধে কিছু জানুক। আর হ্যাঁ, এক্ষেত্রে তোমার আমার মধ্যে শুধু বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে সম্পর্কই থাকবে, অন্য কিছু নয়।' কথাগুলো বলেই পতিত পেছন ফেরেন।

মগরা ফিবতে পরিমলের বেশ রাত হয়ে গেল আজ। বেশ বুঝতে পারছিল গোপা চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়বে, কিন্তু ওর কিছু করার ছিল না। বাড়ির সকলের লিখিত অনুমতি হাতে আসার পর পরিমল অনেকটা নিশ্চিন্তবোধ করছিল। যতক্ষণ অবধি না গোপাকে বলতে পারছে ততক্ষণ সে স্বস্তি পাচ্ছিল না। প্রথমে মা যেরকম ব্যবহার কবলেন পবিমল ভাবতে পারেনি দ্বিতীযবাব তিনি আবার ডেকে পাঠাবেন। গোপাকে এসব কথা বলা যাবে না। বিশেষত মায়ের সব কথা শুনলে ও ভীষণ কষ্ট পাবে। এমনও

হতে পারে ও বাড়িভাড়া নেবার ব্যাপারেও আপত্তি তুলতে পারে। পরিমল ফেরার পথে মনে মনে ভেবে নিচ্ছিল গোপাকে কীভাবে বলবে। যদিও এভাবে ভাবনাচিন্তা করার ব্যাপারে সে খুব একটা পারদর্শী নয়, তবুও গোপাকে এই অবস্থায় কোনরকম মানসিক উত্তেজনার মধ্যে সে ফেলতে চায় না।

দূর থেকে তাকে আসতে দেখে যথারীতি উদ্বিগ্ন গোপা প্রায় ছিটকে তার কাছে এল। পরিমল তাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে বিছানায় বসাল। গোপার নানা অনুযোগ, অভিযোগ শেষ হলে একে একে সব ঘটনা বলে গেল সে। বাবার বিশেষ আপত্তি না তোলা, পল্লবীর অতি সহজে রাজি হয়ে যাওয়া থেকে ব্যবসায় যোগ দিতে চাওয়া সব বললেও বনলতার ব্যাপারে রেখে-ঢেকে বলল সে। শেষ পর্যন্ত সবাই লিখিত ভাবে অনুমতি দেওয়ায় বাগবাজারের নতুন বাড়িতে প্রেস কবার ব্যাপারে যে কোনও বাধা থাকল না, এটা ভেবে দুজনেই বেশ স্বস্তি পেল। এবার যত তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্ক-লোনটা পাওয়া যায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। লালমোহনবাবু বলেছেন, মেশিনপত্র কেনার ব্যাপারে তিনি সবরকম সাহায্য করবেন। অতএব মোটামুটি একটা জায়গায় আসা গেল।

বাবা বলেছিলেন আজই একবার বাড়িটা গিয়ে দেখে আসতে। একতলার কোন্ ঘরটা সে নিতে চায় সেটা ঠিক করে ফেলতে হবে। কিন্তু একটা জরুরি কাজ থাকায় লালমোহনবাবুকে পরিমল বলে গিয়েছিল যত দেরিই হোক সে এসে কাজটা তুলে দেবে। কাজেই আজ বাড়ি দেখতে যাবার প্রস্তাবটা সে বাতিল কবেছিল। গোপা জানতে চাইছিল বাড়িটা কি অবস্থায় আছে। পরিমল সেটা জানে না। তবে দ্বিতীয়বার ওপর থেকে আসার পর গুরুপদর সঙ্গে তার অনেকক্ষণ গল্প হয়েছে। তখন গুরুপদর কাছ থেকেই পরিমল জানতে পেরেছে ও-বাড়িতে বাবা ভাড়াটে বসাতেই চান। শিবনাথকাকা নাকি তাঁর গ্রামের কোনও পরিচিতকে ইতিমধ্যেই বাবার কাছে নিয়ে এসেছিলেন। কথাবার্তাও হয়েছে তার সঙ্গে। ভদ্রলোক আর তার স্ত্রী নাকি থাকবেন দোতলায়। ওই বিরাট বাড়িতে দুজন একা কীভাবে থাকবেন কে জানে। পরিমল মনে মনে ঠিক কবল, খুব শীঘ্রই একদিন গিয়ে সে দেখে আসবে বাগবাজারেব বাড়ির অবস্থা।

॥ ৫ ॥

শেষ অবধি অনেক কাণ্ডের পর পরেশবাবু আর সবমাকে বাগবাজারের নতুন বাড়িতে নিয়ে এসেছিল শিবনাথ। শিবনাথের মেসে পরেশবাবুকে দেখে সরমার যা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা মনে করলে এখনও হাসি পায় শিবনাথের। কিন্তু দক্ষ রাজনীতিকেব মত দু-পক্ষকেই একটা সমঝোতায় নিয়ে আসতে পেরেছিল সে। সবমারই আপত্তি ছিল বেশি। যে জীবনের মধ্যে এতদিন সে ছিল সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নতুন করে কিছু ভাবার মত সাহস বা মানসিকতা তার ছিল না। সঙ্গে একটা দ্বিধাও কাজ করছিল। যে লোকটা তার স্বামী ছিল, যার সঙ্গে এককালে বেশ কয়েকটা বছর সংসার করেছে—তাকেই ত্যাগ করে অন্য একজনের হাত ধরে একদিন সে বেরিয়ে গিয়েছিল। সময়ের পাকেচক্রে তারপর যে অন্ধকাব জগতের মধ্যে গিয়ে সে পড়েছিল—অনেক নোংরামো তাকে বাকি জীবনে দেখতে হয়েছে। স্বপ্নেও ভাবেনি আজ এত বছব পবে পরেশেব সঙ্গে তাব দেখা

হতে পারে। আর কি হাল হয়েছে মানুষটার! জীর্ণ-শীর্ণ ভেঙে নুয়ে পড়া পর্যুদস্ত মানুষ একটা। একে নিয়ে সরমা করবে কি এখন, যেখানে তার নিজের ভবিষ্যতই সম্পূর্ণ অনিশ্চিত!

বাড়িওয়ালা তাদের বাসা থেকে উৎখাত করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে—এই সত্যিটাও মুহূর্তের জন্য ভুলতে বসেছিল সরমা। শিবনাথ অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে তাকে রাজি করিয়েছিল বাগবাজারের বাড়িতে উঠে আসতে, জীবনের বাকি দিনগুলো একটু অন্যরকমভাবে কাটাতে। শেষ পর্যন্ত শিবনাথ আর কারও কাছে তাদের আসল পরিচয় প্রকাশ কববে না এই শর্তে সরমা আসতে রাজি হয়েছিল।

পতিতপাবনের সঙ্গে পরেশবাবু কথাবার্তা বলে আসার দিন-দুয়েকের মধ্যেই জিনিসপত্র সমেত পরেশবাবু আর সরমা বাগবাজারের নতুন বাড়িতে উঠে এসেছিল। আসবাবপত্র বলতে তাদের প্রায় কিছুই ছিল না। পরেশবাবুর নিজের প্রয়োজনের সামান্য ক'খানা জিনিসপত্র ছাড়া প্রায় খালি হাত! সরমাও সেরকম কিছুই আনতে পারেনি। কারণ সে যে বাড়ি চিরকালের মত ছেড়ে যাচ্ছে একথা পাঁচকান হতে দিতে চায়নি। কিন্তু বাড়িতে এসে তার চক্ষু চড়কগাছ! ঘরদোর পরিপাটি করে সাজানো-গোছানো। একধাবে মাঝারি মাপের একটা খাট। তাতে বিছানা পাতা। ঘরের একদিকে একটা কাঠের আলমারি। অন্যদিকে টেবিল-চেয়ার-আলনা ইত্যাদি। এমনকি ঠাকুবের সিংহাসনটুকুর ব্যবস্থাও করা আছে। পরেশবাবু তো ঘর দেখে খুব খুশি। কিন্তু সরমার সন্দেহ হয়েছিল, সে শিবনাথকে সরাসরি প্রশ্ন করেছিল, 'এত সব ব্যবস্থা কবল কে?' শিবনাথ এড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সরমা নাছোড়বান্দা। সে জোর করাতে শিবনাথ শেষ অবধি বলেছিল সে নিজেই এসব বন্দোবস্ত করেছে। সরমা তখন আবার প্রশ্ন তুলেছিল, 'তার এত গরজ কীসের? কীসের স্বার্থ তার?' এ প্রশ্নের উত্তরও পাশ কাটিয়ে গিয়ে শিবনাথ বলেছিল, 'দুনিয়ায় সবাই সবকিছু নিজের স্বার্থের জন্যই করে না, এমন কিছু কিছু মানুষ আছে যারা অন্যের জন্য জীবনটা কাটিয়ে দেয়।'

সরমা এসব কথায় না ভুললেও তাকে আর কথা বাড়াতে দেয়নি শিবনাথ। চাল-ডাল তরিতরকারি মশলাপাতি বাসনপত্র এসবের ব্যবস্থা করে দুজনের সংসার মোটামুটি গুছিয়ে দিযে গিয়েছিল সে। সেই থেকে বাগবাজারের নতুন বাড়িতে নতুন ঠিকানা পরেশ ও সরমার। সবসময় জমজমাট লোকজনের শোরগোলের মধ্যে জীবন কাটিয়ে এই বিশাল বাড়িতে মাঝে মাঝে দমবন্ধ লাগে সরমার। বিশেষত দুপুরবেলাটা—যেন খাঁ খাঁ করে চারিদিক। শিবনাথ বলে গিয়েছিল শীঘ্রই আরও ভাড়াটে আসবে—কিন্তু এতদিন তো হযে গেল, কেউ এল না। পরেশবাবু দিনের বেশিরভাগ সময় শুয়ে বসেই কাটিয়ে দেন। মাঝেমধ্যে কাছেপিঠে বেরোন, সেও অল্প সময়ের জন্য। বরাবরই লোকটা অলস প্রকৃতির ছিল। কিন্তু সরমার সময় আর কাটতে চায় না। দুজন মানুষের রান্না করতে আর কতটুকু সময় লাগে। বাকি সময়েব বেশিরভাগটাই কাটিয়ে দেয় পুজোআচ্চা নিয়ে। কিন্তু তবু দিনের প্রতিটি ঘণ্টা কি ভীষণ লম্বা লাগে। নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসে। মাঝেমধ্যে টুকটাক কথাবার্তা হয় পরেশের সঙ্গে। একটা দীর্ঘ সময় আলাদা থাকার দরুণ দুজনের জীবনের না-জানা অধ্যায়ের কথা শুনে সময় কাটে। এইভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে চলছিল ওদের দুজনের সময়ের চাকা।

রাত্রি নটার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে যায় পরেশের। সরমাব এত তাড়াতাড়ি খাওয়া অভ্যেস নেই। সে পরেশের খাওয়া হলে তারপর খায়। স্বামীর খাওয়ার সময় পাশে বসে খেতে দিতে দিতে নানা কথাবার্তা হয়। আজ বাজার থেকে শখ করে একটু মাছ কিনে এনেছিল পরেশ। সবমা সরষে-বাটা দিয়ে ঝাল বানিয়েছিল। দীর্ঘদিন অভ্যেস না থাকলেও সরমার রান্নার হাতটা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়নি। খাওয়া শেষ করে একটা পরম তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলল পরেশ। তারপর সরমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কতকাল পরে এমন মাছের ঝাল খেলাম! ভুলেই গিয়েছিলাম এর স্বাদ!'

'সে তো তোমার খাওয়া দেখেই বুঝতে পারছি। আচ্ছা, শরীরের যে এই হাল করেছ, কাশীতে থাকতে খাওয়া জুটত না কীসের জন্যে?' সরমা জিজ্ঞেস করল।

'কি কবে জুটবে বলো! যে মহাজনেব কাছে খাতা লেখার কাজ করতাম, শবীর খারাপ হবাব পর সে দিল ছাড়িযে। আবার যে ঘুরে ঘুরে কাজের খোঁজ করব, সে শক্তিও আর ছিল না, ইচ্ছেও ছিল না।' পরেশ আঙুল চাটতে চাটতে বলল।

'কেন? আর কিছু না হোক, বাবার মন্দিরের ভোগ তো ছিল!' সবমা তাকাল স্বামীর দিকে।

'তা ছিল। কিন্তু রোজ রোজ ওই এক ভোগ খেতে আমার ভাল লাগত না। তার ওপর জ্বরো জিভে ওই স্বাদ একেবারে একঘেয়ে হয়ে গিয়েছিল। তাই মাঝেমাঝেই না খেয়ে পড়ে থাকতে হত। আর সত্যি কথা বলতে কি, আমিষ খাওয়া-দাওযা জুটত না তাই, নইলে মনে মনে তো আর এসব ত্যাগ করতে পাবিনি।' পরেশ হাসে।

'সে তোমার ওই কাঁটা বেছে বেছে মাছ খাওয়া দেখেই বুঝতে পেরেছি। মিথ্যেই তুমি কাশীবাসী হয়েছিলে, মন তোমার এখনও আসক্তিতে পূর্ণ।' সরমা কটাক্ষ করে।

'ঠিকই বলেছ! তবে এখন মনে হয়, ওই কাশীতে গিয়েছিলাম বলেই বোধহয় তোমার সঙ্গে ক্ষীণ যোগাযোগটুকু থেকে গিয়েছিল।' পরেশ অন্যরকম গলায় কথাগুলো বলে। সবমা যেন মুহূর্তের জন্য বিষণ্ণ হয়ে যায়। পরেশ সেটা লক্ষ্য করে। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পব জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি ... খবর ... পেয়েছিলে?'

সরমা তাকায়, 'কি?'

'ও যে .. মারা গেছে! তোমাকে একটা চিঠি পাঠানো হয়েছিল।'

'কে পাঠিয়েছিল সেই চিঠি? তুমিই তো।' সরমার কপালে ভাঁজ।

পরেশ সামান্য অস্বস্তির সঙ্গে বলে, 'হ্যাঁ।'

'চিঠির তলায় নাম-সই করোনি কেন?' সরমা জেবা করে।

'নামটা কি খুব দরকার ছিল? আসল তো হল খবর পাওয়া।' পরেশ ধীবে ধীবে বলে।

'বাজে কথা!' সরমা সামান্য উঁচু গলায় বলে, 'আসলে তোমার সাহসে কুলোয়নি। তুমি কি ভেবেছিলে আমি তোমার হাতের লেখা চিনতে পারব না? কিন্তু কেন বলো তো? সমাজ যাকে অন্যায় বলে, পাপ বলে—সে কাজ তো করলাম আমি, অথচ তুমি আমায় সারাজীবন ভয় পেয়ে চললে। কেন?'

'অন্যায় তো আমিও করেছিলাম সরমা। তোমাকে বিয়ে করেছিলাম—অথচ তোমাকে সুখী করতে পারিনি।'

'ও! সেই অপরাধবোধেই বুঝি তুমি সেই ঘটনার পর আর কখনও মাথা তুলে আমার সামনে দাঁড়াতে পারলে না! আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য, কেন সরমা, আশ্চর্য কেন?' পরেশ তাকায় সরমার দিকে।

'আজ এত বছর পরেও আমার সেদিনের সেই রাগ মনে পড়ে যাচ্ছে, জানো? মনে হচ্ছে চল্লিশ বছর আগেকার সেই আমি বলছি, এমন পুরুষ-মানুষ বিয়ে করে কেন? সংসার করে কেন? অপদার্থের মত শুধু স্ত্রীকে সন্দেহ করতে পারে, আর অন্য কিছু দিতে পারে না!'

পরেশ মাথা নাড়ে, 'ঠিক! ঠিকই বলতে তুমি। কিন্তু তখন আমার সেইসব কথা শুনে রাগ হত। মাথায় রক্ত চড়ে যেত। তোমাকে ধরে ধরে ... মারতাম।'

সরমা বড় বড় চোখে তাকায় স্বামীর দিকে, 'তোমার মনে আছে?'

'কি?'

'তুমি যে আমায় মারতে?'

'হ্যাঁ, সরমা। অনেক চেষ্টা করেও ভুলতে পারিনি। আজ এত বছর ধরে সেইসব অপরাধবোধেই তো ভুগতাম। বিশ্বাস করো, তোমার ওপর আর এতটুকু ক্ষোভ হত না, রাগ হত না। নিজেই নিজের হাত কামড়াতাম। কত চেষ্টা করেছি এসব ভুলতে, কিন্তু পারিনি। আজ আমার মনে হয়, তুমি ঠিকই বলতে!'

'ঠিক বলতাম?'

'হ্যাঁ। সত্যিই তো, আমি তো তোমাকে কিছুই দিতে পারিনি।'

কৌতুকের হাসি খেলে যায় সরমার চোখে, 'তাহলে তুমি অমন করতে কেন?'

'কি জানি! আসলে বয়স কম ছিল। সহ্য করতে পারতাম না। অল্পেই রেগে উঠতাম। এখন বুঝতে পারি।' পরেশ যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলে।

সরমা অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর শ্বাস ফেলে, 'না গো। দোষ শুধু তোমার একার ছিল না, দোষ আমারও ছিল। তখন বুঝিনি, সুখ পেতে গেলে সুখ দিতেও জানতে হয়। আমিও তো তোমায় কোনওদিনই সুখ দিতে পারিনি। কি করে দেব বলো, আমারও তো তখন অল্প বয়স। মনে নানা শখ-আহ্লাদ। সেসব মিটত না বলে সব সময়েই তোমার ওপর মনটা চড়ে থাকত। মনে হত এই লোকটা আমাকে শুধু ব্যবহার করছে, বিনিময়ে কিছুই দিচ্ছে না।' কথা থামিয়ে সরমা হঠাৎ স্বামীর দিকে তাকায়, 'আচ্ছা, এতসবের পরেও তুমি আবার এই শেষ কটা দিন আমার সঙ্গে থাকার জন্য এত অস্থির হচ্ছিলে কেন?'

পরেশ বলে, 'হয়তো ... হয়তো এতে আমাদের দুজনেরই প্রায়শ্চিত্ত হবে!'

'প্রায়শ্চিত্ত!' সরমা হাসে, 'প্রায়শ্চিত্ত করতে গেলে শুধু এ-জন্ম কেন, আর একটা জন্মেও কুলোবে না। এত পাপ জমে গেছে আমার!'

পরেশ চোখ ছোট করে, 'কেন? আর কারো কাছে পাপ জমেছে তোমার?'

সরমা আবার শ্বাস ফেলে, 'কার কাছে নয়। তোমার কাছে, তার কাছে, এমনকি কদিন আগে যে বুড়ি মারা গেল তার কাছে, সব থেকে বড় কথা নিজের কাছে। এ জন্মে কেন আরও পাঁচটা জন্মেও আমার পরিত্রাণ নেই।'

'বুড়ি মানে, বাগবাজারের দিগম্বর মিত্তিরের ধর্মপত্নী বিন্দুবাসিনী দেবী?' পরেশ

হতভম্ব, 'তার কাছে তুমি আবার কি পাপ করলে?'

সরমা যেন চমকে ওঠে। তাড়াতাড়ি কথা ঘোরায়, 'দিদি আমাদের কত ভালবাসত বল তো? আমাদের জন্য জীবন দিত। সেই তাকেও ধোঁকা দিয়ে তো আমি চলে গিয়েছিলাম। সেটা পাপ নয়?'

পরেশ চুপ করে থাকে। তারপর একটু ইতস্তত করে নিচু স্বরে বলে, 'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব সরমা? ... কিন্তু তুমি রাগ করতে পারবে না।'

সরমা তাকায়, 'তুমি তো জানো আমি ধানাই-পানাই একেবারে পছন্দ করি না—যা জানবার সোজাসুজি জিজ্ঞেস করো।'

পরেশ মুখ নামায়, তারপর বলে, 'সেই ছেলেটা ... সে নিশ্চয়ই আমার সন্তান ছিল না?'

সরমা যেন আমূল কেঁপে ওঠে, 'হঠাৎ এ প্রশ্ন? যে প্রশ্নের জন্য আমাদের সম্পর্কটা ভেঙে খান-খান হয়ে গেল, আমার সংসার ভেঙ্গে গেল আর আমি নোংরা পাঁকে তলিয়ে গেলাম, আজ তুমি আবার সেই প্রশ্ন করছ? কি লাভ এর উত্তর জেনে?'

'এই প্রশ্ন আমি সেদিনও করেছিলাম—তুমি জবাব দাওনি।'

'আজও দেব না।'

'কেন সরমা, কেন?' আজ তো আর কোনও অসুবিধে নেই, আজ তোমার উত্তর দিতে বাধা কোথায়?'

সরমা একটু থামে, তারপর মাথা নাড়ে, 'বাধা আছে। তুমি হয়তো এক্ষুনি জানতে চাইবে সে ছেলে কোথায়?'

পরেশ ধীরে ধীরে বলে, 'ছেলেটা যদি আমার নাও হয়ে থাকে—যদি বিশ্বনাথেরই হয়—তাহলেও সমাজের চোখে আমিই তার বাবা। কিন্তু এমনই হতভাগ্য বাবা যে, একটা বারের জন্যও ছেলের মুখ দেখতে পেলাম না। একবার তো ইচ্ছে হয় তার মুখ দেখি।' পরেশ সরমার দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকায়।

কিন্তু সরমা সে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়, 'এ ব্যাপারে আমি তোমাকে কোনরকম সাহায্য করতে পারব না।'

'কেন? তোমার সঙ্গে কি তার কোনও যোগাযোগই ছিল না কোনদিন?' পরেশ ব্যগ্রভাবে জানতে চায়।

'তোমার সন্দেহের জ্বালায় অস্থির হয়ে যখন ঠিক করেছিলাম তোমার ঘর ছাড়ব, তখনই সে ছেলেকে আমি ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছিলাম। তার সঙ্গে আমার আর কি করে যোগাযোগ থাকবে?'

'তুমি...সত্যি বলছ সরমা?' পরেশের কণ্ঠে আকুলতা।

এই আকুলতা সরমাকে নাড়িয়ে দিয়ে গেলেও তাতে সাড়া দিল না সে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কথা ঘোরাল, 'নাও নাও, কত রাত হয়ে গেল, এঁটো হাতে বসে আছ, হাত ধোও গিয়ে। আমিও যাই খেতে বসি।' পরেশ একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায়। সে স্পষ্টই বোঝে সরমা এ ব্যাপারে আর কোনও কথা বলতে চায় না।

একসঙ্গে পাশাপাশি থাকলেও এই একটা ব্যাপারে দুজনের মধ্যে যেন এক লক্ষ যোজন দূরত্ব। সময় যখন কাটতে চায় না, তখন দুজনেই অতীতে ডুব দেয়। যে অতীত

দুজনের একসঙ্গে কেটেছে, যার বেশিটাই তিক্ততায় ভরা তা নিয়েও যেমন কথা হয়, আবার যে অতীত দুজনে বিচ্ছিন্নভাবে কাটিয়েছে, যা পরস্পরের কাছে অজানা সেই নিয়েও গল্পে মশগুল হয়। এভাবেই পরস্পরকে নতুন করে জানা-চেনার কাজ চলে। কিন্তু পরেশ লক্ষ্য করেছে, সরমা কিছু কিছু প্রসঙ্গ সযত্নে এড়িয়ে চলে। সেটা যে কেন পরেশ বুঝতে পারে না। অদ্ভুত এক কৌতূহল কাজ করে তার মনে। সরমার জীবনের না-জানা প্রতিটি অধ্যায়ের পাতা ওলটাতে ইচ্ছে করে তার। জানে এতদিন পর এই অধিকারবোধের কোনও স্থান নেই সরমার অনুভূতিতে, তবুও নিজেকে এর থেকে মুক্ত করতে পারে না। যে সরমা একদিন শুধুই ছিল তার—ছিল তার ইচ্ছাধীন, তারই একান্ত আজ্ঞাবাহক—সেই সরমা যে নিজের মত করে এতটা জীবন কীভাবে কাটিয়েছে তা পরেশকে আশ্চর্য করে দেয়। আকাশকুসুম কল্পনা করে সে। কল্পনার পাখায় রঙ লাগায় আর তাতে ভর করে উড়ে বেড়ায়। হাতড়ে বেড়ায় সরমার মন—কিন্তু সে মনের নাগাল পাওয়া বড় কঠিন। সরমা বারবারই পিছলে পিছলে যায়। গল্পের ঝাঁপি খুলে বসলেও সে সদা সতর্ক থাকে। পরেশের অস্থির লাগে মাঝে মাঝে।

অনেক সময় খটামটিও লেগে যায়। যদিও পরেশ জানে এখন তাদের মধ্যে তিক্ততা আসা মানে ক্ষতি পরেশেরই। সরমার মনের জোর আছে, সে ঠিক নিজের ব্যবস্থা করে নিতে পারবে। কিন্তু পরেশ জানে, তার মন ভেঙে গেছে। আত্মবিশ্বাস বলতে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। সে পারবে না একা থাকতে। কাজে কাজেই সরমাকে বেশি চটাতে চায় না সে। আর একটা ব্যাপার পরেশ লক্ষ্য করেছে, সেই নরম-সরম সামান্য লাজুক সরমা আর নেই। তার চেহারায় এখন আত্মবিশ্বাসের ছাপ। তার ব্যবহারে এখন ব্যক্তিত্বের ছটা। সেই প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বের সামনে কেমন যেন গুটিয়ে যায় পরেশ। অদ্ভুত এক অনিশ্চয়তায় ভোগে সে। মনে যাই থাক, পরেশ সর্বদাই চেষ্টা করে সরমার মনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে। এতে মাঝে মধ্যে তার ঝুঁকে যাওয়া পৌরুষে আঘাত লাগলেও তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই।

কয়েকদিন পরের কথা। দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে পরেশ বিশ্রাম নিচ্ছিল, সরমা এসে পাশে বসল। পরেশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি গো, অত আকাশকুসুম কি ভাবছ?'

পরেশ চোখ খুলে তাকায় সরমার দিকে। তাকিয়েই থাকে। সরমা সেটা লক্ষ্য করে বলে, 'ও কি, ওভাবে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইলে যে?'

পরেশ অল্প হাসে, 'তোমায় দেখছি।'

'মরণ!' সরমা মুখ বেকায়, 'তোমার কি সত্যি সত্যিই মতিচ্ছন্ন হল নাকি?'

'আরে না। যাই বলো সরমা, তুমি কিন্তু আগের থেকে অনেক সুন্দর হয়েছ। সেই ছাপোষা মধ্যবিত্ত বাড়ির বউ-এর আটপৌরে রূপে পাক ধরলেও এর এখন অন্য মাদকতা আছে। জৌলুস বেড়েছে। এই বয়সে এসেও কি সুন্দর চেহারাটাকে ধরে রেখেছ।'

'থাক, থাক, অনেক আদ্দিখ্যেতা হয়েছে। রূপের সুখ্যাতি অনেক শুনেছি, আর ওসব ভাল লাগে না। তবে সত্যি বলতে কি, তোমার চেহারাটা যেন একটু বেশিই বুড়িয়ে গেছে।' সরমা হাসে, তারপর বলে, 'যাকগে, চেহারা নিয়ে এ বয়সে আর কি হবে! তবে বিধির বিধান আর কে এড়াতে পারে? কোনদিন কি আমরা কেউ ভেবেছিলাম আবার এ

চেহারা আমাদের দেখতে হতে পারে?'

সরমার কথা শুনে পরেশ হাসে। সরমা ভ্রূকুটি করে, 'হাসছ যে বড়!'

'হ্যাঁ, হাসছি এই কারণে যে, তুমি কত চেষ্টা করলে আমার কাছ থেকে পালিয়ে থাকার জন্য—তবু দ্যাখো ঠিক সেই আমাদের দেখা হলই। ঠিকই বলেছ, বিধির বিধানই বটে।' পরেশ থামে। তারপর হঠাৎ বিষণ্ণ সুরে বলে, 'শুধু যদি সময় থাকতে এই মিলনটা ঘটত, তাহলে—'

'তাহলে কি?' সরমা স্পষ্ট চোখে তাকায়।

একটা গভীর শ্বাস ফেলে পরেশ মাথা নাড়ে, 'নাঃ, কিছু না!'

সরমা বলে, 'আমি জানি, যা কিছু ঘটে গেছে, তার জন্য আমাকেই তুমি মনে মনে দায়ী করো। আসলে কলঙ্ক যা কিছু তা তো মেয়েমানুষেরই লাগে।'

পরেশ তাড়াতাড়ি উঠে বসে, 'না, বিশ্বাস করো, আমি কক্ষনো তোমাকে দায়ী করি না। দায়ী করি আমার ভাগ্যকে।'

সরমা যেন ফোঁস করে ওঠে, 'ভাগ্য, ভাগ্য, ভাগ্য! চিরটাকাল তোমার মুখে ওই একটা কথাই শুনে এসেছি—ভাগ্য! তোমার মত অকর্মণ্য পুরুষ নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারে! কিন্তু আমি তোমার মত সবসময় ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে রাজি নই।'

'সে আমি জানি। তবে কথাটা ঠিক সরমা, যা কিছু ঘটে গেছে, তার জন্য আমি কখনও তোমার কাছে কোনও অনুযোগ করিনি। বলো, করেছি কি?' পরেশ শান্ত করার চেষ্টা করে সরমাকে।

কিন্তু সরমা শান্ত হয় না, 'করবেটা কি করে? তোমার মুখের সামনে রোজ দু-বেলা ভাতের থালা ধরে দিতে আমি বিন্দুমাত্র কসুর করিনি। করেছি কি? অথচ কোথা থেকে এল সেই ভাতের জোগাড়—তোমাকে তা বুঝতেও হয়নি। এতটাই স্বার্থপর ছিলে তুমি সেদিন!'

পরেশ মাথা নামিয়ে বলে, 'আমি স্বীকার করছি সে কথা। কিন্তু বিশ্বাস করো তখন কর্মহীন অবস্থায় আমি কেবল শুধু নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবতেই মশগুল ছিলাম।'

'আর তাই আমার দিকে ফিরেও তাকাওনি। আমাদের দুজনের বিচ্ছেদের শুরু কিন্তু সেই দিন থেকে, তুমি সে কথা ভুলে যেতে পারো না!' সরমা হিস-হিস করে।

পরেশ মাথা নাড়ে, 'না, পারি না তো। কিন্তু সে তো যতদিন আমার সংসারে ছিলে ততদিন! তারপর? তারপর তুমি ভেসে গেলে কেন? বিশ্বনাথের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েও তো সংসার পেতেছিলে। তবে কেন তোমাকে যেতে হল ওই পাঁকের মধ্যে? এর জন্য তো আমাকে দায়ী করতে পারো না।'

সরমা জ্বলন্ত চোখে তাকায়, 'আমার ঘরের মানুষটা যদি ঠিক থাকত, তাহলে তো আমাকে ঘরছাড়াই হতে হত না। ঘর থেকে বেরিয়ে তারপর কীসের থেকে কি হয়েছে সে খোঁজে তোমার দরকার কি? দায়িত্ব যখন নিতে পারোনি সেদিন, আজ তোমার কাছে কৈফিয়ত দিতে যাব কোন্ দুঃখে শুনি!'

পরেশ সরমার এই রূপের কাছে মিইয়ে যায়, 'কৈফিয়ত তোমার কাছে আমি চাইনি সরমা। সে যোগ্যতাও আমার নেই। কিন্তু একটা কথা বলবে? সেদিন বিশ্বনাথের

সঙ্গে তোমার ঘর ছাড়ার কি খুব দরকার ছিল?'

সরমা অন্য দিকে তাকায়, 'আমি জানি না।'

পরেশ উঠে এসে একেবারে সরমার পাশটাতে বসে। তারপর সরমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আজ তো আমাদের দুজনেরই নতুন করে পাবার বা হারাবার কিছু নেই সরমা। আজ অন্তত সত্যি কথাটা বলো। বিশ্বনাথকে তুমি ভালবেসেছিলে কেন? আমাদের অভাবী সংসারে ও দুবেলা দুমুঠো ভাতের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল বলে?'

সরমা চোখ তুলে তাকায়, 'সেদিন কিন্তু বিশ্বনাথবাবুর ওই দানের কম মূল্য ছিল না। তুমি সেকথা আজকে ভুলে যেতে পারো না। আজ আমার স্বীকার করতে আর লজ্জা নেই, তোমার বন্ধু বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়েছিলাম। খানিকটা ইচ্ছেয়, খানিকটা অনিচ্ছেয়।'

'শুধুই কি জড়িয়ে পড়া সরমা, যে কারণে তুমি ঘর ছেড়েছিলে তার জন্য কি অন্য কিছু কারণ ছিল না?'

'কারণ? কি বলতে চাও তুমি স্পষ্ট করে বলো দেখি?' সরমার গলার স্বর আবার গাঢ় হয়।

পরেশ সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, 'না না, থাক সেসব কথা। স্পষ্ট করে কিছু বলার মত মুখ আমার নেই।'

সরমা পরেশের জামা টেনে ধরে, 'বলার মুখ যদি নাই থাকে, তাহলে আজ এত কথা বলছ কেন? সেদিন কিছু বলোনি কেন, অ্যাঁ? তোমার চোখের সামনে তোমার বিয়ে করা বউ অন্য পুরুষের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে দেখেও মুখ বন্ধ করে ছিলে কেন? নিজের সুবিধের জন্যেই তো?'

পরেশ ধীরে ধীরে যেন নিজেকে প্রবোধ দেবার জন্যই বলে, 'যে ইচ্ছে করে ভেসে যেতে চায়, তাকে ধরে রাখবার মত মনও আমার ছিল না, শক্তিও আমার ছিল না। তুমিই তো একটু আগে আমাকে বললে, দু-বেলা দু-মুঠো ভাত মুখের সামনে ধরবার সাধ্যও ছিল না আমার!'

সরমা এবার ডুকরে ওঠে, 'কার জন্যে? কার জন্যে এই অবস্থা হয়েছিল শুনি? আমার দোষে? ইস্কুলের চাকরিটা খোয়াতে হয়েছিল কেন? মদ আর জুয়োর নেশায় কে জড়াতে বলেছিল? আমি?'

পরেশ আস্তে আস্তে সরমার হাত ছাড়িয়ে উঠে গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়াল, 'আজ আর এসব কথা-চালাচালি করে লাভ কি সরমা। বাদ দাও এসব কথা।'

'কেন? কথা যখন তুললে, তখন বলতে হবে বইকি। মাঝপথে থামলে তো চলবে না।'

বাইরের দিকে তাকিয়েই পরেশ মাথা নাড়ে, 'লাভ নেই, লাভ নেই। কোথা থেকে শুরু হয়েছিল—কার পা প্রথমে পিছলেছিল সে হিসেব আজ এতদিন পরে আর করা যাবে না সরমা।'

বড় বড় চোখে হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সরমা, তারপর এগিয়ে যায় পরেশের কাছে, 'তার মানে? তুমি বলতে চাও, আমার জন্যই তুমি ওভাবে বিপথে চলে গিয়েছিলে? তোমার জীবনে যা কিছু ক্ষতি হয়েছে তার জন্য আমি দায়ী? তোমার

নিজের কোনও ভূমিকা ছিল না?'

পরেশ এবার অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে, 'তোমাকে তো বললাম সরমা, এসব অতীতের কথা টেনে এনে নিজেদের মধ্যে ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই। যা হয়ে গেছে তাকে তো আমরা কেউই আর ফিরিয়ে আনতে পারব না। তবে লাভ কি এমন সব কথার?'

'কথা আমি তুলিনি। তুলেছ তুমিই। আমি বুঝতে পারি রাত্রিদিন তুমি এসবই ভাবো আর ছুতো পেলেই কথা পেড়ে বসো। কিন্তু আমার সঙ্গে আর চালাকি করতে এসো না। আমি আর সেই সরমাটি নেই যে তোমার চাল ধরতে পারব না!'

পরেশ এগিয়ে এসে সরমার হাত দুটো ধরে। তারপর সন্ধির গলায় বলে, 'আমারই মাথাটা আসলে মাঝে মাঝে খারাপ হয়। তুমি রাগ কোরো না। আমরা দুজনেই আর বেশিদিন বাঁচব না। যা হয়েছে হয়েছে—এই কটা দিন না হয় আমরা পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে বাঁচি!'

॥ ৬ ॥

নিজের ফ্ল্যাটে এসে প্রবাল নিশ্ছিদ্র স্বাধীনতা উপভোগ করছিল। পতিতপাবন রায়ের ছেলে হিসেবে নয়, একজন স্বতন্ত্র মানুষ হিসেবে বাঁচতে চেয়েছিল সে বরাবরই। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা একজন মানুষকে কতটা আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে পারে এটা সে নিজের ক্ষেত্রে দেখেছে। আগে চূড়ান্ত অনিচ্ছে সত্ত্বেও বাধ্য হত পতিতপাবন রায়ের মর্জিমত জীবনটাকে চালাতে। সেসব দিনগুলোর কথা চিন্তা করলে এখনও শিউরে ওঠে প্রবাল। ভাবতে অবাক লাগে তার, শুধুমাত্র ওই একটা লোকের জন্য তার জীবনটা একেকটা সময়ে কত বড় বড় বাঁক নিয়েছে। ছাত্র-রাজনীতিতে সমর্পিত-প্রাণ প্রবাল কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি সে বিদেশে ব্যারিস্টারি পড়তে যাবে। যাবতীয় বিপ্লব মুখথুবড়ে এসে পড়েছিল ওই একটা লোকের গোঁ-এর কাছে। রীতিমত ব্ল্যাকমেল করে তাকে পাঠানো হয়েছিল বিদেশে। প্রবাল সেই সোনালি দিনগুলো সময় পেলেই হাতড়ায়। কলেজ-জীবনের উচ্ছলতা কর্মজীবনের সেরা সাফল্যেও পাওয়া যায় না। এর সঙ্গে মন্দিরা। ওই প্রথম মনে মনে একজনকে ভালবেসেছিল প্রবাল। সে ভালবাসাও শেষ হয়ে গিয়েছিল তার অনিশ্চিত জীবনের কাছে। একেবারে শিকড় ছিঁড়ে তাকে পাঠানো হয়েছিল সম্পূর্ণ নতুন একটা পৃথিবীতে, যে পৃথিবী সম্বন্ধে আদৌ আগ্রহী ছিল না সে।

কিন্তু মানুষের মত সহনশীল জীব বোধহয় আর হয় না। প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে তার জুড়ি নেই। প্রতিবাদ, প্রতিরোধের পাঁচিল সরিয়ে প্রবালও পরিবেশের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তথাকথিত বিরূপ আবহাওয়ায় প্রবাল সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে উঠেছিল। ব্যারিস্টারি পড়াটা হয়ে উঠল উপলক্ষ, প্রবাল জীবনটাকে চিনল। এখন প্রবাল ভাবে, একরকম ঘাড় ধরে তাকে বিদেশে পাঠানো হয়েছিল বলেই বোধহয় জীবন সম্বন্ধে এমন সম্যক ধারণা সে লাভ করতে পেরেছিল। যদিও বাবার আশা শেষ অবধি সে পূর্ণ করেনি, ব্যারিস্টারি পড়া ছেড়ে অন্য জীবন বেছে নিয়েছিল, তথাপি তার কোনও ক্ষোভ নেই এ বিষয়ে। নিজের সিদ্ধান্তের ওপর তার

ভরসা ছিল, আর ছিল আত্মবিশ্বাস। তার জোরেই প্রবাল আজ এই জায়গায়। কোম্পানির জন্য সে যেমন তার সবটুকু দিচ্ছে, তেমন তার সবরকম সুবিধে-অসুবিধের দায়দায়িত্বও কোম্পানি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে।

শুয়ে শুয়ে প্রবাল এইসব কথা ভাবছিল। আজ রবিবার। অফিস ছুটি। যদিও ছুটির দিনেও প্রবাল মাঝেমধ্যেই অফিসে যায়, কিন্তু আজ বাড়িতে সে নিশ্চিন্ত ছুটি উপভোগ করছে। একা একা। এই এক অসুবিধে। কাজের মধ্যে থাকলে এসব মনে আসে না। কিন্তু বাড়ি ফিরে আর সময় কাটতে চায় না। আজ অবশ্য একটা ব্যতিক্রম ঘটবে। প্রবালের এই ফ্ল্যাটে সাধারণত কেউ আসে না। অফিসের দু-একজন ছাড়া এখনও অবধি কেউ আসেনি। মগরা যাবার আগে শুধু পরিমল আর গোপা একবারের জন্য এসেছিল। আর সেইদিনই ঠাম্মা মারা গেল। আজ দুপুরে প্রবালের বহুদিনের পুরোনো বন্ধু দেবর্ষি আসবে। কয়েকদিন আগে অফিসে ফোন করেছিল। কলেজ ছাড়ার পর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আর তেমন যোগাযোগ নেই। প্রবাল কারও খোঁজ করেনি। কেন, সে নিজেও বুঝতে পারে না। দেবর্ষি কোথা থেকে তার খোঁজ পেয়ে হঠাৎই ফোন করে তাকে। সেদিনই ঠিক হয়েছিল রবিবার দুপুরটা একসঙ্গে কাটাবে। প্রবালের ফ্ল্যাটে রান্নাবান্নার খুব একটা ব্যবস্থা নেই। কাজ চালাবার গোছের দু-একটা জিনিস ছাড়া বেশিরভাগটা প্রবাল বাইরেই মিটিয়ে নেয়। দেবর্ষি সেই শুনে বাইরে কোথাও লাঞ্চের প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু প্রবালের কেমন যেন রবিবারটা বাড়িতেই কাটাতে ইচ্ছে করছিল। সেই শুনে দেবর্ষি বলেছে লাঞ্চের ব্যবস্থা সেই করে আনবে। বাকি পানীয়ের ব্যবস্থাটা যেন প্রবাল করে। সেইমত প্রবাল তৈরি হয়ে বসে আছে।

এগারোটা নাগাদ দেবর্ষি এল। হাতে বিশাল বড় দুটো খাবারের প্যাকেট। সে দুটো ওর হাত থেকে নিয়ে প্রবাল এক দৌড়ে ভেতরে রেখে এল, তারপর বন্ধুকে জড়িয়ে ধরল। দুজনেই অবাক হয়ে খানিকক্ষণ দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর হো হো করে হেসে উঠল। দেবর্ষি বলল, 'এ কি দেখছি আমি! কাঁধে ঝোলা, পরনে ফতুয়া, সেই বিপ্লবীর আজ একি রূপ! এ তো পুরোদস্তুর বুর্জোয়া সাজপোশাক। হায় বিপ্লব!'

প্রবাল হাসে, 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক। এও একধরনের বিপ্লব ব্রাদার। তোমার মাথায় ঢুকবে না। তুমি তো কোনদিন এসবের ধারই ঘেঁষলে না। সারাজীবন মহিলা প্রজাতি নিয়ে গবেষণা করেই কাটালে!'

দেবর্ষি হেসে ওঠে, 'ওঃ প্রবাল, সেসব দিন গেছে। তবে যাই বলিস, ওই গবেষণার ফলে জীবন সম্বন্ধে নতুন একটা ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যা চলার পথে আমাকে বহুভাবে সাহায্য করেছে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এক্ষুনি এক্ষুনি তোকে তার ব্যাখ্যা দিতে হবে না। আয় বোস, অনেক সময় আছে। ধীরে ধীরে তোর গবেষণালব্ধ ফলাফল ও তার প্রভাব সম্বন্ধে জানব। এখন একটু রিল্যাক্স কর!'

সারা দুপুর দুই বন্ধু অতীতে ডুব দিয়েছিল। পানীয়ের বন্দোবস্ত প্রবাল করে রেখেছিল। তাতে মন ভিজিয়ে সাঁতার কাটছিল অতীতে। বিদেশি কোম্পানির ঝকঝকে এক্সিকিউটিভ প্রবাল রায় যেন খোলস ছেড়ে বেরোতে পেরে নিজেকে সামলাতে পারছিল না। যাবতীয় আবেগ, অনুভূতি, পাওয়া না পাওয়ারা হুড়মুড় করে বেরিয়ে বন্ধ

ঘরের হাওয়ায় ভাসছিল। পানীয়ের ঝিমঝিমে অনুভূতি প্রবালকে আরও বেশি আবেগপ্রবণ করে তুলেছিল। ঠিক এই মুহূর্তে প্রবাল যেন বুঝতে পারছিল কি ভীষণ একা সে। একজন মানুষের সাহচর্য তার এই যন্ত্রণায় প্রলেপের কাজ করছিল। দেবর্ষি নিজের কথা বলার চেয়ে প্রবালের জীবনের গল্পই শুনে যাচ্ছিল। তার মধ্যেই প্রবাল জানল তার ব্যারিস্টারি পড়তে চলে যাওয়ার সময়ে দেবর্ষিও কলকাতা ছেড়েছিল বছরখানেকের জন্য, পুনে ফিল্ম ইন্সটিটিউটে কোর্স করার জন্য। ওখান থেকে পাশ করে কয়েকটা ডকুমেন্টারি আর অ্যাড ফিল্ম করার পর এখন পুরোদস্তুর বাংলা কর্মাশিয়াল ফিল্ম তৈরি করছে। প্রবাল শুনে চমকে উঠেছিল। এইসব সিনেমা-থিয়েটারের জগতের সঙ্গে তার একেবারেই যোগাযোগ নেই। তবুও দেবর্ষির কথা শুনে সে হেসে ফেলল। দেবর্ষি তার হাসির অর্থ ধরতে পেরে বলল, 'ভারতবর্ষ' নামে একটা আর্ট ফিল্ম তৈরি করেছিল দুই বন্ধু মিলে। একজন আয়রন মার্চেন্ট ছিল ছবিটার প্রযোজক। পাঁচদিনও চলেনি হলে। সাধারণ মানুষ সিনেমা দেখতে গিয়ে এসব অ্যান্টেনা তোলা বিষয় দেখতে আগ্রহী নয়। শেষ পর্যন্ত এসব বিশুদ্ধবাদীদের রাস্তা ছেড়ে পুরোদস্তুর কমার্শিয়াল জগতে নাম লিখিয়েছে সে। প্রযোজকের টাকা সুদে-আসলে ফেরত দেওয়াটাও যে ছবি-নির্মাতাদের একটা অন্যতম দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এটা সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। এখন তার হাতে গোটাতিনেক প্রযোজক। তার ছবি মফঃস্বল আর গ্রামবাংলায় সুপার-ডুপার হিট। দুরন্ত ব্যবসা করছে। মানুষের পারিবারিক আবেগ-আনন্দ-দুঃখ-বেদনাকে হাতিয়ার করেই আপাতত সে এগিয়ে চলেছে। এবং এর দৌলতে ইন্ডাস্ট্রিতে সে এখন বেশ নামকরা পরিচালক। সঙ্গে ফ্ল্যাট-গাড়ি-ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সও একটা ভদ্রস্থ জায়গায় এসে গেছে।

প্রবাল বন্ধুকে বাহবা দিল। কথায় কথায় দেবর্ষি জানাল সে এখনও বিয়ে করেনি। এবং প্রবালকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েই অবধারিত ভাবে মন্দিরার প্রসঙ্গ উঠল। দেবর্ষি মাথা নেড়ে বলল, 'সত্যি, মন্দিরাটা যে তোর সঙ্গে এরকম করবে আমি ভাবতেও পারিনি!' প্রবাল তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলাতে চাইল। কিন্তু দেবর্ষি ছাড়ার পাত্র নয়। সে প্রবালকে চেপে ধরে জানতে চাইল, 'তুই কি ঠিক করেছিস, সারাজীবন মন্দিরার তপস্যা করেই কাটাবি, নাকি এবার বিয়ে-থা করে সংসারী হবি?'

হো হো করে হেসে ওঠে প্রবাল, 'কে বলল তোকে আমি বিয়ে করিনি? আমি তো কবেই বিয়ে করে ফেলেছি!'

দেবর্ষি অবাক হয়ে তাকায়, 'তার মানে!'

'হ্যাঁ রে, এই ফ্ল্যাটে তো আমি বেশিক্ষণ থাকি না, তার সঙ্গেই থাকি সবসময়।'

'যাঃ, ইয়ার্কি কবিস না!' দেবর্ষি তখনও বিশ্বাস করে না।

'আই অ্যাম সিরিয়াস! তবে বিয়েটা কোনও মহিলার সঙ্গে হয়নি, হয়েছে আমার চাকরির সঙ্গে!'

দুজনেই হেসে ওঠে একথায়। দেবর্ষি এবার উঠে বসে, প্রবালেব দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলে, 'অনেকক্ষণ ধবে কথা ঘোরালি, এবার আর ছাড়ছি না। সত্যি করে বল তো, তোর ব্যাপারটা কি? আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। কেন তুই এই ফ্ল্যাটে আছিস? ব্যারিস্টারি পড়তে গেলি, ভেবেছিলাম ফিরে এসে বাবার সঙ্গে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করবি, তা নয়, হয়ে গেলি বিদেশি কোম্পানির এক্সিকিউটিভ। কোনটার সঙ্গেই

তো কিছু মিলছে না। আমাকে খুলে বল।'

প্রবাল কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। তারপর মাথা নাড়ে, 'ছাড় ওসব কথা। আমি সব ভুলে গেছি। ওসব মনে করে আর কোনও লাভ নেই। আমার এই বর্তমানটাই আসল সত্যি।'

দেবর্ষি বলে, 'সে না হয় হল, কিন্তু কিছু তো বলবি আমাকে। মনে আছে কলেজ লাইফে এমন কোনও কথা ছিল না, যা তুই আমাকে বলতিস না! মন্দিরার সঙ্গে যাবতীয় ঘটনা সব আমাকে বলতিস। এমনকি তোর বাবার সঙ্গে তোর যে বরাবরের বিরোধ তাও মাঝেমধ্যে গল্প করতিস। তাহলে এখন বলতে আপত্তি কোথায়? নাকি আমাকে আর বিশ্বাস করতে পারছিস না?'

প্রবাল মাথা নাড়ে, 'না রে, সেরকম কিছু না। পরিস্থিতির কারণেই এতদিন দুজনের দেখা হয়নি। তার জন্য বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? আসলে এসব আমি ভুলে যেতে চাই। অতীতটা পুরোপুরি মুছে ফেলে নতুনভাবে জীবন শুরু করেছি। এখানে আমি স্বাধীন। আমার জীবনটা একান্তভাবেই আমার। তাছাড়া আমি মনে করি এসবের জন্য আমি নিজেই দায়ী। হয়তো আমিই কারও সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলাম না!'

'এসব তোর অভিমানের কথা। একা তুই তো সব কিছুর জন্য দায়ী হতে পারিস না। সেটা সম্ভবও নয়। এক হাতে কখনও তালি বাজে না। তুই আমাকে বল—দ্যাখ, নিজের ভেতরে যা চেপে রেখেছিস, আমার সঙ্গে ভাগ করে নে, দেখবি অনেক হালকা লাগবে।' দেবর্ষি প্রবালের পিঠ চাপড়ায়।

প্রবাল কিছুক্ষণ জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকে। অ্যালকোহলের প্রতিক্রিয়ার কারণেই হয়তো তার চোখের সামনে একে একে সব ঘটনা ফুটে উঠতে থাকে। মন্দিরার সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘটনা, প্রবালের বিদেশ যাওয়া এবং সেই সময়ে প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক নেতা শুদ্ধরঞ্জন ভট্টাচার্যকে মন্দিরার বিয়ে করে দিল্লি চলে যাওয়া—এসব ঘটনা দেবর্ষির জানা। কিন্তু তারপরে বিদেশ থেকে ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি নিয়ে ফিরে আসা প্রবাল রায়ের জীবনে যা কিছু ঘটে গেছে তার সব বলতে গেলে তো এক দিনে তা ফুরোবে না!

আসলে ছেলেবেলা থেকে কখনোই প্রবালের জীবনটা সহজ সরলভাবে চলল না। পরিমলেব মত অত নির্বিকার ভঙ্গিতে সে সবকিছুকে দেখতে পারত না। তার চারিপাশে যা কিছু ঘটছে, তার সবকিছু যে সঠিক পথে ঘটছে না—এরকম একটা বোধ তার ছোটবেলা থেকেই ছিল। এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় তাব বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। আপাত-দৃষ্টিতে রায় পরিবারের এই জৌলুসের আড়ালে যে অনেক অন্ধকারের খেলা চলত এটা সে বুঝে গিয়েছিল। কিন্তু নিজের কর্মজীবনে এসে সে বুঝেছিল সৎপথে সহজভাবে বাঁচব বললেই বাঁচা যায় না। তার মূল্যবোধ, তার আদর্শ পদে পদে হোঁচট খেতে লাগল এই নতুন জীবনে এসেও। বেঁচে থাকতে গেলে, টিকে থাকতে হলে কিছু সাজানো খেলা খেলতেই হয যাকে আধুনিক পৃথিবীতে আর অন্যায় বা পাপ বলে মনে করা হয় না। এর বিরোধিতা করেও লাভ নেই। কারণ এর উলটোপথে চলতে গেলে নিজেকেই পিছিয়ে পড়তে হয়। আর সেটা প্রবাল কখনই চায় না। তাই বেঁচে থাকতে গিয়ে এই ক-বছরে অনেক আপোসই তাকে করতে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনে আরও অনেকরকম

চোরাস্রোতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এসব কথা এখন দেবর্ষিকে কীভাবে বলবে! কিন্তু দেবর্ষি নাছোড়বান্দা। দরকার হলে আজ রাতটা সে এখানে থেকে যেতেও রাজি, তবু সে প্রবালকে দিয়ে কথা বলাবেই।

অগত্যা ঝাঁপি খুলে বসতে হল প্রবালকে। কোম্পানির ওয়ার্কারস ইউনিয়নের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসার জন্য যে তাকে একাধিকবার তাদের নেতা শুদ্ধরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে বা কথা বলতে হয়েছে সেটা শুনে দেবর্ষি অবাক হয়ে গেল। যেহেতু শুদ্ধরঞ্জনের আরেকটা পরিচয় হল সে মন্দিরার স্বামী—প্রবাল কি করে এত সহজে ব্যাপারটা মেনে নিল সেই ভেবে সে অবাক। ঝন্টু সিকদারকে নিয়ে শুদ্ধরঞ্জনের সঙ্গে তার মতবিরোধের কাহিনী যদিও প্রবাল সেভাবে কিছু বলল না, এবং একইভাবে শেষ পর্যন্ত বাবার প্রতি কি কারণে তার বিতৃষ্ণা চরমে গিয়ে পৌঁছেছিল, যার জন্য সে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হল সে প্রসঙ্গেও খুব একটা গেল না। কারণ প্রবালের সন্দেহ যতই দৃঢ় হোক ঝন্টু সিকদারের খুনী হিসাবে পতিতপাবন রায়কে দায়ী করার মত কোনও প্রমাণ তার হাতে নেই। একই কথা খাটে মা সিংহবাহিনীর মূর্তির শিল্পী গগন পালের হত্যার ব্যাপারেও। দুটো ক্ষেত্রেই কিছু প্রমাণ করা যায়নি। অথচ প্রবাল নিজের কাছে একশোভাগ পরিষ্কার যে এর পেছনে পতিতপাবন রায়ের প্রত্যক্ষ হাত রয়েছে। এসব প্রসঙ্গ এড়িয়ে প্রবাল তার কর্মক্ষেত্রের গল্প বলতে লাগল।

কোম্পানির প্রধান শ্রমিক ইউনিয়নকে বুদ্ধিদীপ্তভাবে ট্যাক্‌ল করে ম্যানেজমেন্টের কাছের লোক হয়ে ওঠার কাহিনী—ধীরে ধীরে পদোন্নতি—জুনিয়র এক্সিকিউটিভ থেকে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ পদে উত্তরণ। এখন মনে পড়লে নিজেরই অবাক লাগে তার, ওই একরাশ জেহাদ ঘোষণা করা শ্রমিকদলের সামনে একা প্রবাল রায়। তাকে ঘেরাও করার জন্য তারা বদ্ধপরিকর। তাদের ৯-দফা দাবি পেশ করার পর ছ-মাস কেটে গেছে, কোম্পানি কোনও ব্যবস্থা নেয়নি, সুতরাং আর তারা ধৈর্য ধরতে রাজি নয়। প্রবাল রায়কে ঘেরাও করে তারা লাগাতার ধর্মঘটের পথে যাবে। টেবিলের উলটোদিকে দাঁড়িয়ে ইউনিয়নের প্রতিনিধি যখন আঙুল তুলে তাকে শাসাচ্ছে, ওই প্রবল চাপের মধ্যেও কিন্তু প্রবাল হেসেছিল। তাকে হাসতে দেখে ইউনিয়ন নেতা স্বাভাবিক ভাবেই আরও ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনি হাসছেন? আমাদের কি আপনার ভাঁড় মনে হচ্ছে?'

প্রবাল শান্ত গলায় বলেছিল, 'তা নয়। আমি জানতাম ঘেরাও, ধর্মঘট এগুলো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চরমতম অস্ত্র। কিন্তু আপনারা যেভাবে যত্রতত্র এদেরকে ব্যবহার করছেন, দুদিন পরে এসবেরও আর কোনও গুরুত্ব থাকবে না। সব গা-সওয়া হয়ে যাবে।'

ইউনিয়ন প্রতিনিধি জোর-গলায় বলে উঠেছিল, 'আপনার কাছ থেকে ভাষণ শুনতে আমরা আসিনি। সোজাসুজি বলুন, আমাদের ব্যাপারটা নিয়ে আপনি কতদূর এগিয়েছেন?'

প্রবাল একই রকম ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল, 'সে কৈফিয়ত আমি আপনাদের দিতে বাধ্য নই। তবে একটা কথা জেনে রাখুন, আপনারা যত অ্যারোগ্যান্ট হবেন, কোম্পানি কিন্তু ততই বেঁকে বসবে। আপনারা যদি ধর্মঘট করেন, আমাকে তিনদিন আটকে রাখেন, তাহলে আর যাই হোক আমার কিছু এসে-যাবে না। মাঝখান থেকে আপনারাই আরও

পিছিয়ে যাবেন।'

অন্য একজন বেশ রোখ নিয়ে বলে উঠেছিল, 'কিছু যায়-আসবে না যে বলছেন, আপনি করবেনটা কি? আপনাকে তো আমরা টেলিফোনটাও করতে দেব না!'

প্রবাল আবার হেসেছিল, 'আমি কিছুই করব না। ইনফ্যাক্ট আমাকে কিছু করতে হবেও না। যা করার ম্যানেজমেন্টই করবে। পুলিশ আসবে। আমাকে আপনাদের কর্ডন ভেঙে বের করে নিয়ে যাবে। আপনারা কিছু করতে পারবেন না। কেউ আপনাদের প্রোটেকশন দেবে না। ম্যানেজমেন্ট না, পুলিশ না, সম্ভবত পার্টিও না।'

উত্তেজিত ইউনিয়ন প্রতিনিধি প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল, 'পার্টি আমাদের প্রোটেকশন দেবে না? আপনি কি করে জানলেন একথা? কে বলেছে আপনাকে?'

চোখ ছোট করেছিল প্রবাল, 'ইউনিয়নের নেতা হয়ে এটুকু বোঝেন না, কোনও পার্টিই চট করে এসব বড় বড় কোম্পানির সঙ্গে শত্রুতা করতে চায় না? আপনারা যতই আন্দোলন করুন, তারা তাদের মতই চলবে! তাদের সিদ্ধান্তই আপনাদের মেনে নিতে হবে। একটা সহজ কথা মনে রাখবেন, আপনাদের অধিকারের থেকেও তারা তাদের পার্টির লাভ-ক্ষতির অঙ্কটাকেই বেশি গুরুত্ব দেবে।'

প্রবালের এরকম ঠাণ্ডা গলার কথা শুনে ইউনিয়ন প্রতিনিধি দমে গিয়েছিল। মুখের ওপর এরকম চরম সত্যির চটজলদি উত্তর তার জোগায়নি, যদিও আশেপাশের সঙ্গী-সাথীদের দিকে তাকিয়ে সে নিজেকে দ্রুত মানিয়ে নিয়েছিল। তারপর গলা নামিয়ে বলেছিল, 'তাহলে আপনি কি বলতে চান আমাদের ডেপুটেশন সম্বন্ধে আপনার কোম্পানি কিছুই ভাববে না?'

এবার প্রবাল ঘাড় নেড়েছিল। চোখের কোণে অদ্ভুত একটা হাসি লেগে ছিল তার, ইউনিয়ন প্রতিনিধির সহসা গলা নামানোর থেকেই সে সার-সত্য বুঝেছিল প্রবাদ বাক্যটির, 'অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স!' এবার সে বলেছিল, 'শুনুন আপনাদের ৯-দফা দাবি সম্বন্ধে আমি ইতিমধ্যেই ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে তিনবার মিটিং করেছি। ফাইনাল মিটিং-এ ম্যানেজমেন্ট আপনাদের পি. এফ., বোনাস-এর দাবি মেনে নিয়েছে। কিন্তু ওই ৯-দফা দাবির চারটি মেনে নিলেও বাকি পাঁচটা আগামী বছরের জন্য পোস্টপন্ড করে রেখেছে।'

প্রবালের কথা শেষ হওয়ামাত্র ঘরে অদ্ভুত একটা নীরবতা তৈরি হয়েছিল, এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে করতেই ফিসফাস গুঞ্জন শুরু হল। ইউনিয়ন প্রতিনিধি পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল প্রবালের কথা শুনে। গোটা ঘরের মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে হাসি পেয়ে গিয়েছিল প্রবালের। ঘোর কাটিয়ে উঠে ইউনিয়ন প্রতিনিধি বলে উঠেছিল, 'আপনি তো অদ্ভুত মানুষ! একথাটা তো আগে বললেই পারতেন। তাহলে তো এত কথাই আসত না।'

প্রবাল হেসেছিল, 'কথা কতদূর আসতে পারে সেটাই তো দেখছিলাম আমি। যাদের নিয়ে কাজ করছি, তাদের ভাবনা-চিন্তা, শক্তি সবটা আমাকে জেনে নিতে হবে না? নাহলে তো আমারই কাজের মুশকিল, তাই না? যাক গিয়ে, যে কথাটা বললাম, যেহেতু কোম্পানি আপনাদের বেশিরভাগ দাবিগুলোই মেনে নিয়েছে সেহেতু আপনাদের আপাতত আমাকে ঘেরাও বা ধর্মঘটের প্রশ্ন আসছে না। আপনারা এবার নিজেদের কাজে যেতে পারেন।'

ইউনিয়ন প্রতিনিধির রাগী চোখ ততক্ষণে নরম হয়ে এসেছে। অনুতাপের গলায় প্রবালকে বলেছিল, 'কিছু মনে করবেন না স্যার, আপনি প্রথমেই একথাগুলো বলে দিলে এতসব অভদ্রতা হত না। তবে একটা কথা, এখানে তো আমাদের ইউনিয়নের সব মেম্বাররা আসেনি, তারা যখন শুনবে ওই পাঁচ দফা দাবি মেনে নেওয়া হয়নি, তখন হয়তো আবার গোলমাল শুরু করবে।'

'সেটা আমার সমস্যা নয়, আপনার সমস্যা। তবে একটা কথা আপনাকে বলতে পারি, সবসময় চিৎকার, চেঁচামেচি করে দাবি আদায় করা আর খেটে খাওয়া মানুষের জন্য লড়াই-এর কথা বলাটাই রাজনীতি নয়—রাজনীতির একটা বড় অস্ত্র হচ্ছে কৌশল। সে কৌশল করার কায়দাগুলো শিখুন। দরকার হলে আপনাদের পার্টির নেতার সঙ্গে আলোচনায় বসুন। এটা সম্পূর্ণ আপনাদের নিজেদের ব্যাপার। আমার যতদূর করার আমি করেছি।'

ইউনিয়ন প্রতিনিধি আর কথা না বাড়িয়ে প্রবালের বাড়িয়ে দেওয়া হাতে হাত মিলিয়ে সঙ্গীসাথীদের নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর প্রবালের মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠেছিল! সে জানত পি. এফ., বোনাসের দাবি কোম্পানিকে একটা-না-একটা সময়ে মেনে নিতেই হত। বাকি ৯-দফা দাবির মধ্যে যে চারটে ম্যানেজমেন্ট আপাতত মেনে নিয়েছে সেগুলো খুবই নিরীহ। কিন্তু কর্মীদের আসল দাবিগুলোই তারা এড়িয়ে গেছে। কিন্তু প্রবালের কিছু করার নেই, তাকে উভয় পক্ষকে নিয়েই চলতে হবে। যে সমস্ত ওয়ার্কার্স তার অধীনে কাজ করছে তাদের দাবিগুলো যে খুব একটা অসঙ্গত নয় একথা সে ভালই বোঝে। তবুও তারাও খুব একটা শক্তিশালী হয়ে যাক, এটা সে চায় না। অন্যদিকে ম্যানেজমেন্ট সবসময়েই চাইবে, যে দায়িত্ব তারা প্রবালকে দিয়েছে তাকে সঠিকভাবে তা পালন করতে হবে। তার যাবতীয় সুবিধে-অসুবিধে দেখার দায়িত্ব যখন কোম্পানি নিয়েছে তখন প্রতিটি কাজের হিসেব-নিকেশও তারা বুঝে নেবে। প্রবাল উভয় তরফকেই খুশি করতে পেরেছিল।

এই অবধি বলে প্রবাল থামল। দেবর্ষি অবাক হয়ে শুনছিল প্রবালের কথা। সেই প্রবাল! ছাত্র-নেতা হিসেবে যে নাকি তখন হিরোর মর্যাদা পেত! দাবি-দাওয়া পেশ করা এবং সুচারুভাবে তা আদায় করা এ ব্যাপারে যার নাকি জুড়ি ছিল না! প্রবাল দেবর্ষির মনোভাব ধরতে পারল। বন্ধুর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি রে, কি ভাবছিস? ছাত্রনেতা প্রবাল রায় এরকম সুবিধেবাদীর মত ব্যবহার করতে কীভাবে শিখল?'

দেবর্ষি হাসে। কোনও উত্তর দেয় না। প্রবাল বলে, 'দেখ, একটা ব্যাপারে আমি নিজের কাছে ভীষণ পরিষ্কার। অযথা শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ যেমন করব না, তেমনি আন্দোলনের নামে কোম্পানির উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টিও আমি মেনে নেব না। এই করে আমাদের দেশটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। নিজের অধিকার সম্বন্ধে, মর্যাদা সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন থাকা উচিত, কিন্তু তার পাশাপাশি যারা আমার রুটি-রুজি যোগান দিচ্ছে, তাদের স্বার্থও আমাকে দেখতে হবে বইকি। আর এটা তো অস্বীকাব করবি না—পিছন থেকে সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীকে লেলিয়ে দিয়ে অনেক বড় বড় পার্টির নেতাই মজা লোটে। আন্দোলন সফল হলে বড় বড় করে কাগজে হেডলাইন হয়—তখন এই শ্রমিকদের নাম

কোথাও আসে না। কখনও আবার সমঝোতার নামে কোম্পানির কাছ থেকে নিজের সুবিধেটুকু বুঝে নিতেও এইসব নেতারা পিছপা হয় না। সুতরাং আমার ভূমিকায় আমি পরিষ্কার। শ্রমিকের স্বার্থহানি হচ্ছে কিনা এটা দেখা যেমন আমার কর্তব্য, তেমনই মালিকের স্বার্থরক্ষা করাটাও আমার দায়িত্ব। এতে যদি তুই আমাকে বুর্জোয়া ভাবতে চাস তো ভাবতে পারিস। আই উডন'ট অপোজ!'

দেবর্ষি মাথা নাড়ল, 'আমি সেসব ভাবছি না। শুধু এই ভেবে ভাল লাগছে তখনকার সেই একপেশে চিন্তাধারার কবল থেকে তুই বেরিয়ে আসতে পেরেছিস। বলা যায় অনেক পরিণত হয়েছিস। আসলে তখন তোদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালেও মনে-প্রাণে তোদের ইজম্‌গুলোকে সবসময় মেনে নিতে পারতাম না। অনেক প্রশ্ন তৈরি হত। কিন্তু তোরা তখন এতটাই একরোখা ছিলি, সামান্য প্রশ্নচিহ্নও অ্যাকসেপ্ট করতে পারতিস না।'

'ঠিকই বলেছিস। আসলে তখন জীবনের একটা দিক দেখেছি। রক্ত টগবগ করে ফুটছে। কিছু একটা করে দেখাবার জেহাদ মনের মধ্যে। সঙ্গে বাড়িতে ওই সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশ! ওটা আমাকে আরও তাতিয়ে রাখত। তবে মাইন্ড দ্যাট দেবর্ষি, আজ আমি বিদেশী কোম্পানির এক্সিকিউটিভ বলে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছি সেটা সত্যি, কিন্তু তার মনে এই নয় যে আমার আদর্শ, বিশ্বাস এসব পালটে গেছে। ভাবনা-চিন্তার কিছু গলদ আমাদের মধ্যেও ছিল—সেসবগুলোকে বরঞ্চ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি।'

'যাক গে, তারপর বল, এই যে ম্যানেজমেন্টের সার্টিফিকেটটা পেলি, এর জন্য তোর কি কি বস্তুগত লাভ হল?' দেবর্ষি ঠাট্টা করল।

প্রবাল হাসল, 'সেরকম কিছু নয়। তবে বুঝতেই তো পারছিস, ওয়ার্কারদের মধ্যে একটা বড় ধরনের গণ্ডগোল যে বেধেছিল, এটা তো ম্যানেজমেন্ট বুঝতে পেরেছিল—সেটা এত সহজে মিটে যেতে স্বাভাবিকভাবেই একটু খুশি হয়েছিল। কিন্তু এরপরেই আমি ধীরে ধীরে অন্য একটা ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে গেলাম! এটা আমার জীবনের আর একটা অধ্যায় বলতে পারিস।'

দেবর্ষি যেন রহস্যের গন্ধ পায়। চোখ বড় বড় করে বলে, 'আরি ব্বাস! ইন্টারেস্টিং কিছু মনে হচ্ছে! বল বল, অনেকক্ষণ ধরে ইউনিয়নের কচকচানি শুনলাম—এবার একটু অন্য গল্প পেলে মন্দ হয় না!'

প্রবাল হেসে ফেলে, 'গল্প মানে? রীতিমত ঘটনা। অবশ্য এখন ভাবতে বসলে আমারও গল্পই মনে হয়। কিন্তু এর এক বর্ণও রং-লাগানো নয়, পুরোটাই এই শর্মার জীবনে ঘটে গেছে।'

দেবর্ষি টানটান হয়ে ডিভানে শুয়ে পড়ে। তারপর প্রবালের দিকে তাকিয়ে বলে, 'শুরু করো. শুরু করো—আমার আর তর-সইছে না!'

প্রবাল শুরু করে, 'ইউনিয়নের ঝামেলাটা মিটে যাবার দিন পনেরো পরেই আমাদের কোম্পানির মালিক, মানে যার সঙ্গে আমার লন্ডনে পরিচয় হয়েছিল—বি.কে., উনি ইন্ডিয়ায় এলেন। সৌজন্যের খাতিরেই আমি দেখা করতে গেলাম ওঁর সঙ্গে। কারণ আমার বস্ হলেও লন্ডনে থাকাকালীন ওঁর সঙ্গে একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যদিও ওঁর বাড়িতে কখনওই যাইনি। এখানে ওঁর বাংলোতেই দেখা করতে গেলাম। আমাকে দেখে তো ভীষণ খুশি। বাহবা দিলেন আমার কাজের জন্য। কফি

অফার করলেন। অফিস-সংক্রান্ত সামান্য কিছু কথাবার্তা হল। তারপর উনি একটা অদ্ভুত কথা শোনালেন।'

দেবর্ষি বলে ওঠে, 'কীরকম?'

'আমি উঠব-উঠব করছিলাম, উনি কিছুটা ইচ্ছে করেই আমাকে আটকালেন। বাংলোর বাগানের চেয়ারে বসে কথা বলছিলাম আমরা। এইসময় একটু অন্যরকম গলায় উনি বললেন, জানো প্রবাল, এই যে তোমরা আমাকে সারাক্ষণ বিজনেসের কাজে এদেশ-ওদেশ করতে দেখছ, সর্বক্ষণ এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট-এর হিসেব নিয়ে মাথা ঘামাতে দ্যাখো, এটাই কিন্তু আমার বেঁচে থাকার সব নয়! আমি অবাক হয়ে তাকাতে উনি হাসলেন, অবাক হচ্ছ তো! কিন্তু এটা সত্যি। এর বাইরে আমার একান্ত নিজের একটা জগৎ আছে, সেটা আমার প্যাশন বলতে পারো—দ্যাট ইজ পেনটিং! টু বি ফ্র্যাঙ্ক, এইসব ব্যবসা আমাকে যতটা টানে তার চেয়ে অনেক বেশি টানে আমাকে ছবির জগৎ। বি.কে.-র কথা শুনে আমি তো অবাক। ইনফ্যাক্ট ওঁকে এভাবে কখনও কথা বলতে শুনিনি। আমার সঙ্গে হৃদ্যতা থাকলেও একটা ডিসট্যান্স মেনটেন করতেন। কিন্তু সেদিন বোধহয় উনি অন্যরকম মুডে ছিলেন।' প্রবাল মাথা নাড়ে, 'আজ বুঝি ব্যাপারটা আসলে কি, কিন্তু তখন তো বুঝিনি!'

দেবর্ষি অধৈর্য গলায় বলে ওঠে, 'তারপর কি হল?'

'তারপর আর কি! উনি বলেই চললেন—নিজে ভাল আঁকতে পারি না, কিন্তু যারা আঁকে, প্রকৃত শিল্পী যারা, আর্টকে ভালবেসে জীবন উৎসর্গ করছে, তাদের পাশে দাঁড়াতে চাই। দ্যাখো, পৃথিবীর সব মানুষ আদিমকাল থেকে যে ভাষাটা সহজে বোঝে তা হল ছবির ভাষা। এ এক আশ্চর্য জগৎ, যেখানে কম্যুনিকেশনের জন্য কোনও ইন্টারপ্রেটারের প্রয়োজন হয় না। পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তের মানুষ অন্য প্রান্তে এসেও এ ভাষা নিজেদের মত করে বুঝতে পারে। আমার তাই অদ্ভুত দুর্বলতা এই ছবির জগতের ওপর। একটানা কথা শেষ করে উনি তাকালেন আমার দিকে। তারপর বললেন, তোমাকে এত কথা বলার কারণ হচ্ছে, আমি একটা ইনফরমেশন চাই তোমার কাছ থেকে! আমি অবাক হয়ে বললাম, ইনফরমেশন! কীসের? উনি হাসলেন, চিন্তা কোরো না, খুব শক্ত কোনও কাজ নয়। এখন কলকাতার কোন্ নতুন শিল্পী ভাল আঁকছে, তা কি তোমার জানা আছে? আমি একটু হকচকিয়ে গেলেও বললাম, ছবির ব্যাপারে আমি কোনদিনই খুব একটা উৎসাহী ছিলাম না, কাজেই আমার কিছু জানা নেই। উনি তখন বললেন, ঠিক আছে, সেটা হতেই পারে—পৃথিবীর প্রত্যেকটা লোকের একটা বিষয়ে আগ্রহ নাও থাকতে পারে—কিন্তু তুমি আমার জন্য একটা কাজ কোরো—একটু খোঁজখবর লাগিয়ে এ ব্যাপারে আমাকে জানিয়ো, কেমন?—আমি আর কি করব! বসের আবদার! অগত্যা মাথা নাড়তেই হল। এইসময় ভেতর থেকে একজন মধ্যবয়সী মহিলা, ভীষণ সুন্দরী, বেরিয়ে বাগানের দিকে এলেন। আমি দেখলাম বি.কে চট করে উঠে দাঁড়িয়ে মহিলার দিকে তাকিয়ে ডাকলেন, 'লাবণ্য!' ভদ্রমহিলা দাঁড়ালেন, তারপর আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। বি.কে. পরিচয় করিয়ে দিতে জানতে পারলাম ভদ্রমহিলা ওঁর স্ত্রী। অদ্ভুত একটা ব্যক্তিত্ব চেহারায়। সৌন্দর্যের সঙ্গে সেটা মাখামাখি হয়ে রয়েছে কিন্তু এতটুকু উদ্ধত করে তোলেনি। আমি নমস্কার করতে ভদ্রমহিলা প্রতি-

নমস্কার করলেন। বি.কে. ওঁকে জানালেন লন্ডনে আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার কথা, তারপর দেশে ফিরে ওঁর কোম্পানিতে জয়েন করার কথা। ভদ্রমহিলা তখনও মুখ খোলেননি। শুনে মাথা নাড়লেন। এইসময় বি.কে. হঠাৎ বলে উঠলেন, তোমাকে একটা খবর দিই, লন্ডনে যাওয়ার আগে, প্রবাল কলেজে বামপন্থী রাজনীতি করত।'

শুনেই ভদ্রমহিলা তাকালেন আমার দিকে। তারপর বললেন, 'তারপরে? ওখানে যাওয়ার পর কি সে বিশ্বাস হারালেন?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'না, বিশ্বাস আমি হারাইনি। তবে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি!'

ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে ক্রস করলেন আমাকে, 'তাই যদি হয়—তাহলে আপনি যে চাকরি করছেন, তার সঙ্গে তো ওই বিশ্বাসের কোনরকম বনিবনা হওয়া সম্ভব নয়। তাহলে কি ধরে নেব, পেটেব দায়ে আপনি এই চাকরি করছেন আর বিশ্বাসের ব্যাপারটাকে নিজের মত করে সরলীকরণ করে নিয়েছেন?'

আমি অবাক হয়ে তাকালাম ওঁর দিকে। কি বলব ভেবে পেলাম না। বি.কে.-র মুখ দেখলাম বেশ গম্ভীর। কোনরকমে মুখ দিয়ে বেরোল, 'না...আসলে—।'

ভদ্রমহিলা অদ্ভুত একটা হাসি হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, নমস্কার। আমার একটা কাজ আছে, আমি আসছি এখন।'

আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে উনি চলে গেলেন। এরকম একটা ঘটনায় আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এইসময় বি.কে. আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি ভাবছ প্রবাল?'

আমি কোনও উত্তর দিতে পারলাম না। বি.কে. তখন বললেন, 'লাবণ্য যা বলে গেল, তা কিন্তু ফেরত দেওযার মত নয়! তোমাকে একটা কথা বলি প্রবাল, রাশিয়ায় যখন বিপ্লব শেষ হয়েছে তখন রেলের শ্রমিকেরা কিছু দাবি-দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট করেছিল, যার ফলে দেশে খাদ্য সরবরাহ ব্যাহত হয়। লেনিন তখন বলেছিলেন, দেশের মানুষের কাছে খাবার পৌঁছে দেওয়াটা আমাদের প্রথম কাজ। সেজন্য তিনি আবেদন করেছিলেন ধর্মঘট তুলে নিতে। না নিলে তিনি পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বলপ্রয়োগ করতে। এটা এখানকার বামপন্থী নেতারা কি ভাবতে পারেন? যাঁরা নীতিতে বিশ্বাস করেন, তাঁরা কেন মানবিকতা-বিরোধী হবেন?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'নিশ্চয়ই নন।'

বি.কে. হঠাৎ করে মুড চেঞ্জ করে বললেন, 'তাহলে একটু আগে লাবণ্য যখন তোমায় প্রশ্নটা করল, তখন তুমি উত্তর দিতে পারলে না কেন? আমি চাই না, দ্বিতীয়বার তুমি আর মুখ বন্ধ করে থাকো।' আমি কিছু বলার আগেই বি.কে. বললেন, 'গুড বাই! তাহলে পরে আমাদের দেখা হচ্ছে!'

গোটা ঘটনাটায় আমি এতটাই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম যে সেদিন সারাদিন আমি অফিসের কাজে মন লাগাতে পারিনি। এর মধ্যে গোদের ওপর বিষফোঁড়া, দেখা হয়ে গেল পারমিতার সঙ্গে।'

প্রবাল থামতেই দেবর্ষি লাফিয়ে ওঠে, 'পারমিতা! মানে আমাদের কলেজের সেই লক্কা পায়রাটা? সারাক্ষণ ছেলে ধরার জন্য ঘুর-ঘুর করত? তোর দিকেও তো একটু ট্রাই

করেছিল, নেহাত তুই তখন মন্দিরার সঙ্গে ফেঁসেছিলি!'

'ওসব ছাড়। যাই হোক, পারমিতার সঙ্গে দেখা হওয়াটা আমার জীবনে একটা অ্যাকসিডেন্ট।' প্রবাল বলল।

'কেন? অ্যাকসিডেন্ট কেন?' দেবর্ষি জিজ্ঞাসা করল।

'আরে এতটুকু বদলায়নি মেয়েটা। আর যোগাযোগটাও একটা অদ্ভুত তৈরি হয়েছিল।'

'কীরকম? বাই দ্য ওয়ে, তোর ওই বি.কে.-র পুরো নামটা কি রে?'

'বিপিন কুণ্ডু। কেন? তুই কি ওকেও ফাঁসাবাব তাল করছিস নাকি?'

'আরে না, এমনি জানতে চাইলাম। তারপর বল, পারমিতার সঙ্গে যোগাযোগের কি বলছিলি?'

'হ্যাঁ, সেদিন বিকেলে অফিসের পরে আমি একটু লেকে বেড়াতে গিয়েছিলাম। এমনিই ভাল লাগছিল না। তাই নিজের মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। রেস্তোরাঁর দিকে যেই গেছি, অমনি ভেতর থেকে কেউ যেন নাম ধরে ডাকল। আমি তাকাতেই দেখি পারমিতা হাত নাড়ছে। সঙ্গে একটি ছেলে। অগত্যা ভেতরে গেলাম। পারমিতা তো উচ্ছ্বসিত—ও যেমন করত। উঠে এসে একেবারে হাত ধরে ওদের টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসাল। তার থেকেও আশ্চর্য কি জানিস—যে ছেলেটির সঙ্গে ও বসেছিল—অজয় নাম—দেখা গেল ও আমার কোম্পানিতেই কাজ করে!'

দেবর্ষি তো শুনে হাঁ, 'বলিস কি?'

'হ্যাঁ রে! সেইটেই তো আসল বাঁশ হল!' প্রবাল বলে।

'কীরকম?' দেবর্ষি হাসে।

'কথায় কথায় জানা গেল সেই অজয় বিশ্বাস আমাদেরই পাবচেজ ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। কোম্পানির কাজে বেশ কয়েক মাস বম্বেতে থাকতে হয়েছিল। সবে ফিরেছে। তাই আমার সঙ্গে অফিসে তখনও দেখা হয়নি। তবে আমার নাম শুনেছে। সে কি অবস্থা! পারমিতা তো হইহই করে উঠল। ছেলেটি যদিও আমার আন্ডারে কাজ করে জানলাম কিন্তু ওই মুহূর্তে তো আমি বস-সুলভ ব্যবহার করতে পারি না, তাই সামান্য দু-একটা কথা বলে কাটবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারমিতাকে তো জানিস, ও ছাড়ার পাত্রী নয়। সেই শুরু করল। কলেজের কথা, মন্দিরার কথা, মন্দিরার বিয়ের কথা—এমনকি ও আমাকে কতখানি কেয়ার করত সে কথাও বলতে লাগল ছেলেটির সামনে! ড্রিঙ্কস-এর অর্ডার দিতে যাচ্ছিল, কোনরকমে কাটিয়ে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু হলে কি হবে? ভবী ভুলবার নয়। এর মধ্যে অফিসে অজয় বিশ্বাসের সঙ্গে আমার বারকয়েক দেখা হয়েছে। সামান্য কথাবার্তাও হয়েছে। ব্যাপারটা ঠিকই ছিল। আমার সঙ্গে একটু দূরত্ব রেখেই কথা বলত। আমিও একটা ডিসট্যান্স মেনটেন করতাম। করতে হত। আফটার অল আমি ওর বস্‌। একদিন বলা নেই কওয়া নেই পারমিতা এসে হাজির অফিসে!'

'সে কি রে? মাইরি, একেবারে কাঁঠালের আঠা।' দেবর্ষি মন্তব্য করে।

'আর বলিস না। আমি তো অবাক। বিরক্তি চেপে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার? ও একটা অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে বলল, বসতে বলবে তো? আমি তাড়াতাড়ি বসতে

বললাম। বেশ কিছুক্ষণ কায়দাকানুন করার পর বলল, আমাকে নাকি একটা জরুরি কথা বলবার জন্য ও এসেছে। আমি যথাসম্ভব নরমভাবে বললাম, অফিস আওয়ার্সের পরে যদি সেটা বলা যেত আমার সুবিধে হত। কারণ এখন আমি ব্যস্ত। আবার সেই অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাইছ? কি মুশকিল বল তো। আমি বোঝাতে গেলে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আমার জন্য ও অপেক্ষা করবে। আমার কাজ শেষ হলে তারপর বলবে। সেই সময়ই হবি তো হ, আমার ইমিডিয়েট বস্ মি. সেন আমাকে ইন্টারকমে ডেকে পাঠালেন। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। পারমিতা কিন্তু বসেই রইল। যাই হোক, আমি তো সেনের ঘরে চলে গেলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর কাজ সেরে বেরিয়ে আসছি—নিজের চেম্বারে ঢুকতে যাব, এমন সময় শুনলাম, ভেতরে উত্তপ্ত গলায় কথাবার্তা চলছে। ওভারহীয়ার করা ঠিক নয় জেনেও আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। যেটুকু বুঝলাম পারমিতা অজয়কে অ্যাভয়েড করতে চাইছে। আর তাতেই অজয় ভীষণ আপসেট। সে যে তার লিমিটেশনের বাইরে গিয়ে পারমিতার আবদার মেটায়, পারমিতার ডিমান্ড ফুলফিল করতে সে কত রিস্ক নেয় এসবের ফিরিস্তি দিয়ে চলেছে। আমি দেখলাম ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না। অফিসের মধ্যে বিশেষত আমার চেম্বারে এসব অ্যালাউ করাটা উচিত নয়। একটু ইতস্তত করে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই পড়লাম। আমাকে ঢুকতে দেখে দুজনেই চমকে গেল। বিশেষত অজয়। আমি কিছুই জানি না এমন ভান করে অজয়কে জিজ্ঞাসা কবলাম, সে আমার চেম্বারে কি করতে এসেছিল। ও তো বেচারি আমতা আমতা কবে কোনরকমে জানাল একটা প্রবলেমে পড়ে ও নাকি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছিল। এসে দেখে পারমিতা ওখানে বসে—তাই কথা বলছিল। আমি আর কথা না বাড়িয়ে বললাম মিনিট দশ পরে আসতে। ও বেরিয়ে যেতেই পারমিতা হঠাৎ মুগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, সে নাকি আমাকে যত দেখছে ততই অবাক হয়ে যাচ্ছে। আমি তখন বাধ্য হয়ে বললাম, পারমিতা, আমি এখন অফিসে এবং অনেকগুলো জটিল সমস্যার মুখোমুখি। প্রচুর কাজও বাকি আছে। তোমার যদি কোনও জরুরি কথা থাকে, চটপট বলে ফেলো। পারমিতা খানিকক্ষণ মুখ নামিয়ে বসে থাকল। তারপর বলল, দ্যাখো প্রবাল, কলেজে পড়ার সময় থেকেই আমি তোমাকে ভীষণ রকম অ্যাডমায়ার করতাম। তুমি যদিও সেকথা জানতে না, কারণ তখন তোমার চোখের সামনে শুধুই মন্দিরা! আমি ওকে হিংসে করতাম আর মনে মনে অপেক্ষা করতাম। শেষ অবধি তুমি হঠাৎই লন্ডনে চলে গেলে। কিছুদিন পরে শুনলাম মন্দিরাও এক বড় নেতাকে বিয়ে করে ফেলেছে। মনে মনে ভীষণ খুশি হলেও তখন তুমি ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু ইচ্ছেশক্তির জোর দ্যাখো—ঠিক সেই তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এটাকে তুমি কি বলবে?'

দেবর্ষি উঠে বসে, 'বলো কি বস্, এ থেকে তো হিট ছবির চিত্রনাট্য তৈরি হয়ে যায়!'

'ফাজলামি মারিস না। আমার তখন অবস্থা খারাপ। কোনরকমে বললাম, বেশ তো, তুমি কি বলতে চাও বলো। পারমিতা একেবারে অন্যরকম গলায় বলল, প্রবাল, তোমাকে সেদিন দেখার পর থেকেই মনে হল, আর নিজেকে সরিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তোমাকে আমার দরকার। আমার বেঁচে থাকার জন্য তোমাকে আমার প্রয়োজন। সেই

মুহূর্তে ওকে আর কি বলব। বললাম, সে তো ভালই। এটাই যদি তোমার সমস্যা হয়, তাহলে এখন থেকে আমরা দুজনের বন্ধু। পারমিতা যেন একটু আহত হল, বলল, বন্ধু তো আমরা ছিলামই প্রবাল। কিন্তু তুমি বোধহয় বুঝতে পারছ না আমি কি বলতে চাইছি—অথবা ইচ্ছে করেই বুঝতে চাইছ না। এরপর হঠাৎই ব্যাগ থেকে একটা ডায়রি বের করে তাতে খস খস করে তাতে ওর ফোন নম্বর লিখে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এখানে আমার ফোন নম্বর লিখে দিয়ে গেলাম। আই লাভ ইউ প্রবাল। যদি পারো আমাকে ফোন করো। বলেই গটগট করে বেরিয়ে চলে গেল।'

প্রবাল থামতেই দেবর্ষি বলে ওঠে, 'বলিস কি রে! এ তো অসাধারণ সাহসী প্রেম নিবেদন! কি করলি তুই?'

'আরে আমি করবটা কি? যা করার তো ওই করে দিয়ে গেল। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না তখন। যতদূর মনে হয়েছিল ওই অজয় বিশ্বাস ওর স্টেডি প্রেমিক। সেখানে কি এমন হল যে ও আমাকে এভাবে বলে গেল! আবার মনে হল, এমনও তো হতে পারে, আমার প্রতি হয়তো ওর জেনুইন কোনও ফিলিংস ছিল। আমি গুরুত্ব দিই বা না দিই সেটা অন্য ব্যাপার। ভীষণ কনফিউজড্ লাগছিল। তখনই মনে হল অজয় বিশ্বাস আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিল কিছু একটা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্য, এর সঙ্গে কি তার কোনও যোগাযোগ আছে? সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠালাম ওকে।'

দেবর্ষি হাঁ করে শুনছিল প্রবালের কথা। পারমিতার ব্যবহার শুনে তো ও অবাক। এখন অজয়ের সঙ্গে প্রবালের কি কথা হয়েছিল শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে বসে ছিল। কথার ফাঁকে সিগারেট ধরিয়েছিল প্রবাল। লম্বা লম্বা কয়েকটা টান মেরে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল। অজয় ছেলেটা সম্বন্ধে অদ্ভুত একটা দুর্বলতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল প্রবালের। ঠিক কি কারণে তা সে নিজেও ভেবে পায় না। পারমিতার বন্ধু বলেই কি? কিন্তু তাই বা কেন হবে? পারমিতা তো নিজেই অজয়কে অস্বীকার করে প্রবালের কাছে আসতে চেয়েছিল! কলেজ-জীবনে মন্দিরাকে ভালোবেসে না পাওয়ার যন্ত্রণা প্রবাল অতি সযত্নে লালন করত নিজের মত করে। অজয়কেও হয়তো একইভাবে নিয়েছিল সে। ছেলেটার সঙ্গে কথা বলে প্রবাল বুঝেছিল অত্যন্ত একনিষ্ঠ প্রেমিক সে। এবং হয়তো এই কারণেই ভীষণ বোকা। প্রেমে পড়লে অল্পবিস্তর বোকামি সকলেই করে! নিজের অজান্তেই করে। কিন্তু অজয়ের ক্ষেত্রে সেই বোকামিটা মূর্খামির পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। কলেজ-জীবনের প্রেম একরকম—অন্য মাদকতা কাজ করে তখন—সামনে থাকে রঙিন স্বপ্ন—স্বপ্নের দুনিয়া এবং সেই দুনিয়ায় ভাসমান পরস্পরে লীন দুটি চরিত্র। কিন্তু সেই কল্পনার মায়াজাল কাটিয়ে বাস্তবের মাটিতে পা দিতেও সময় লাগে না। কারণ কলেজের শেষ পরীক্ষাটির ঘণ্টা জানিয়ে দেয়, জীবন এবার তোমার। তাকে গড়েপিঠে নেওয়ার দায়িত্ব একান্তভাবেই এবার তোমাকে নিতে হবে। এতদিন যে অভিভাবকত্বের আড়ালে লুকিয়েছিলে, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে যাবতীয় হিসেব-নিকেশ বুঝে নাও। সুতরাং এইখানে এসে আবেগের বুদ্বুদ একটু থমকায়। প্রেমের মাধুর্য হয়তো তাতে কমে না, কিন্তু পরিণতি আসে। প্রবালের মনে হয় অজয় ঠিক এইখানটাতেই অপরিণত ছিল। হয়তো বা ব্যক্তিত্বের গড়নটাও তার খুব একটা ঋজু ছিল না। নইলে প্রেমিকার চাহিদা মেটাতে যে সমস্ত পদক্ষেপ সে নিয়েছিল তা কখনোই নিতে পারত না।

দেবর্ষি প্রবালের এই অন্যমনস্ক ভাবটা লক্ষ করেছিল। ইচ্ছে করেই প্রবালকে একটু সময় দিতে সে নিজেও একটা সিগারেট ধরিয়েছিল। সেটা শেষ করে তাকাল প্রবালের দিকে, 'কিরে, কি ভাবছিস?'

প্রবাল মাথা নেড়ে বলল, 'না, কিছু না।'

'অজয়ের সঙ্গে কি কথা হল বললি না তো?' দেবর্ষি জিজ্ঞাসা করল।

প্রবাল আড়মোড়া ভেঙে বালিশে হেলান দিয়ে বসে বলল, 'আসলে অজয়ের ব্যাপারটা বলতে গেলে একটু আগে থেকে শুরু করতে হয়। তোকে তো বললাম পারমিতার সঙ্গে ওকে যেদিন প্রথম দেখি, তার আগে ওকে আমি অফিসে দেখিনি। সেইসময়ে ওকে বম্বে পাঠানো হয়েছিল কিছু মেটিরিয়াল পারচেজ-এর জন্য। অফিস থেকে পাঠিয়েছিল একমাসের জন্য। কিন্তু সেই কাজই ও শেষ করতে লাগিয়ে দেয় আরও একটা মাস। মোটামুটি দু-মাস বম্বেতে কাটিয়ে ও কলকাতায় ফেরে। ওখান থেকে ফোনে যোগাযোগ রেখে নানা কারণ দেখালেও কোম্পানি এ কারণে ওর ওপরে একটু খাপ্পাই হয়েছিল। আমি বিষয়টা প্রথমদিকে জানতাম না। নতুন জয়েন করেছি—অন্যান্য কাজ বুঝে নিতেই সময় লাগছিল। কানাঘুষো শুনছিলাম পারচেজ-এ কিছু একটা গোলমাল চলছে, কিন্তু সেটা যে অজয়কে নিয়ে তা আমি বুঝিনি। ইনফ্যাক্ট আমার সঙ্গে পরিচয় হবার পরও ব্যাপারটা আমি খেয়াল করিনি। পরে একদিন মিঃ সেন, মানে আমার ইমিডিয়েট বস্ এসে পুরো ঘটনাটা জানালেন। অজয় যখন বম্বেতে ছিল তখন মার্কেটিং-এর সৌমেন বক্সী বলে একটা ছেলেও সে সময় ওখানে ছিল। মিঃ সেন এই দুজনের মধ্যে কোনও জয়েন্ট অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছিলেন।'

দেবর্ষি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'কি রকম?'

'প্রথম কথা দুজনের আলাদা ডিপার্টমেন্ট হলেও একটা বন্ধুত্ব আগে থেকেই ছিল। দ্বিতীয়ত অজয়ের এই ট্যুর এক্সটেনড্ করাটা কেউই ভাল চোখে দেখেনি। পরে যেটা জানা গেল, যে মালগুলো অজয় ডক থেকে তুলেছিল, সেগুলো আদৌ এক্সপোর্ট কোয়ালিটির মাল ছিলই না। প্রচুর ডিফেক্টিভ মাল বেরোয়। কিন্তু একই রেটে সেগুলো কেনা হয়েছিল। সন্দেহটা দৃঢ় হয় তখন থেকেই।'

'তারপর?'

'তারপর গোপনে খোঁজখবর নেওয়া হল। দেখা গেল, সন্দেহটা ঠিকই। টাকা-পয়সার গণ্ডগোল তো ধরা পড়লই, তার সঙ্গে থার্ড-গ্রেডেড মালের ব্যাপারটাও জানা গেল। এসব নিয়ে যে কানাঘুষো চলছিলই, কলকাতায় আসার পর অজয়ও সেটা টের পেয়েছিল। প্রথমে গুরুত্ব দেয়নি, কিন্তু ক্রমশ পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরেই আমার কাছে এসেছিল।' প্রবাল থামল।

'তুই কি বললি?' দেবর্ষি জানতে চাইল।

'আমি প্রথমে এসব কথা কিছু তুলিইনি। কারণ ঠিক বুঝতে পারছিলাম না অজয় কি বিষয় নিয়ে কথা বলতে চায়। পারমিতার ব্যাপারটাও মাথায় কাজ করছিল। কিন্তু অজয় নিজেই সারেন্ডার করল।'

'বলিস কি!' দেবর্ষি অবাক।

'ঠিক সারেন্ডার করল অবশ্য বলা যায় না—ও নানা কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলছিল।

আমি স্ট্রেট পয়েন্টে গেলাম। জানতে চাইলাম কি হয়েছে? প্রথমে স্বীকার করতে চাইছিল না। নানা অজুহাত দেখাচ্ছিল। জাহাজ আসতে দেরি করেছিল—ডকে কিছু প্রবলেম চলছিল, এইসব আর কি। আমি তখন কোয়ালিটির কথা তুললাম। তখনও একটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। দরকার হলে মাল পরীক্ষা করাবার কথাও বলল, কারণ এ বিষয়ে ও নাকি কিছুই জানে না। এইসময় আমার একটু বিরক্তি লাগল। আর এগোতে না দিয়ে চেপে ধরে বললাম, এসব কথা আদৌ ধোপে টিকবে না। কারণ কোম্পানি দরকার হলে তদন্ত কমিটি বসাবে। নিজে থেকে স্বীকার করলে ভাল, নইলে কমিটি যদি প্রমাণ করতে পারে, তাহলে ওর চাকরি যাবারও সম্ভাবনা আছে। আর প্রমাণ করতে পারার মত যথেষ্ট তথ্য কোম্পানির কাছে আছে। এবার ও ভেঙে পড়ল। আমার কীরকম যেন খারাপ লাগছিল। ছেলেটা যে আদতে খারাপ তা কিন্তু নয়। ব্যাপারটা জানার জন্যই নরম গলায় বললাম, 'দেখুন অজয়বাবু, আপনি এতদিন কোম্পানিতে আছেন। তাকে সার্ভিস দিয়েছেন। যতদূর জানি কোনও খারাপ রিপোর্ট আপনার সম্বন্ধে নেই। একজন সৎ ও একনিষ্ঠ কর্মচারী বলেই কোম্পানি আপনাকে মনে করত। আর হয়তো সেই কারণেই আপনার দ্রুত প্রমোশনও হয়। আমি আপনার সার্ভিস বুক দেখেছি, ঢুকেছিলেন স্টোর ম্যানেজার হয়ে, সেখান থেকে সিনিয়র পারচেজ ম্যানেজার হতে বেশি সময় লাগেনি। আজ হঠাৎ এমন দুর্মতি হল কেন আপনার?'

অজয় কোনরকমে নিজেকে সংযত করল। চোখ ছলছল করছিল, ধরা গলায় বলল, 'দেখুন প্রবালবাবু, আমি আপনাকে সব কথা বলছি—জানি না আপনি বুঝতে পারবেন কিনা, তবুও অন্য কাউকে এসব কথা বলা যায় না। আপনি তো পারমিতাকে চেনেন, ও আপনার বন্ধু ছিল। ওর সঙ্গে আমাব অদ্ভুতভাবেই সম্পর্কটা তৈরি হয়েছিল। এমনিতে ও ভীষণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেয়ে। কিন্তু আমার মত একজন সাধারণ চাকুরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। আমি ওকে ভীষণ ভালোবাসতাম। কিন্তু দিনে দিনে ওর চাহিদা বেড়ে যাচ্ছিল। ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে আমি জেরবার হয়ে যাচ্ছিলাম। ক্লাব, পার্টি, রেস্টোরেন্টে খাওয়া-দাওয়া এসব সামলাতে পারছিলাম না। ও আমার ক্ষমতাটা বুঝতে পারত না। হয়তো বুঝতে চাইতও না। পারমিতার দাবি মেটানো ক্রমশ আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে যাচ্ছিল। ও চাইত যে-কোনও উপায়ে আমি আরও বেশি রোজগার করি। কিন্তু আমার সে সাধ্য ছিল না। এরপরই ধীরে ধীরে আমার মাথায় এসব প্ল্যান কাজ করতে শুরু করে। দেখতাম অনেকেই নানারকম সুবিধে ভোগ করে কোম্পানি থেকে, আমি কখনও তা করিনি, কোম্পানির প্রতি আমি একশো ভাগ সৎ ছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার মাথাটা কেমন পাগল-পাগল লাগত। একদিকে পারমিতার ওইরকম চাপ, অন্যদিকে কোম্পানির কাজে গাফিলতি—এসবের সঙ্গে আর মানিয়ে নিতে পারছিলাম না! আমি জানি না এখন আমার কি হবে। অজয় এবার পুরোপুরি ভেঙে পড়ল। চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছিল। আমি দেখছিলাম ছেলেটাকে। সব সত্যি বলছে কিনা। কেমন যেন মনে হল, ওর কথাগুলোর মধ্যে কোনও অভিনয় ছিল না। কি করব বুঝতে পারছিলাম না।'

দেবর্ষি হঠাৎ রেগে গেল, 'কি করবি মানে, এসব মেরুদণ্ডহীন লোকদেব শাস্তি হওয়াই উচিত। প্রেমে পড়লে শালা সব ভেড়ুয়া হয়ে যায় একেবারে। পারমিতা বলল

বলে কি এদার ও ডাকাতি করত? কি পায় কে জানে এরা!'

'বুঝতে পারছি। আমারও রাগ হয়েছিল প্রথমে। এতদিন ধরে মিশছে, যখন বুঝতেই পারছিল হোয়াট ইজ পারমিতা মৈত্র, তাহলে বেরিয়ে আসছিল না কেন ব্যাপারটা থেকে! কিন্তু কীরকম একটা মায়া লাগল ছেলেটার অবস্থা দেখে। কোম্পানি ওকে স্যাক করতই, ইউনিয়নও সাপোর্ট করত না। ওদিকে পারমিতা কি চাইছিল, সেটাও আমি বুঝতে পারছিলাম। যদি জানতাম ছেলেটা বেসিক্যালি খারাপ—আমি দ্বিতীয়বার ভাবতাম না। কিন্তু ভেতর থেকে একটা তাগিদ অনুভব করলাম, এসব মেয়ের জন্য একটা ভাল ছেলের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে—ভাবতে খারাপ লাগছিল। আমি ওকে সাময়িক একটা আশ্বাস দিলাম, ব্যাপারটা আমি দেখছি বলে। কারণ কতদূর কি করতে পারব সেটা আমিও বুঝতে পারছিলাম না। পুরো পরিস্থিতিটাই ওর বিরুদ্ধে ছিল। অজয় ওটুকু আশ্বাস পেয়েই বিগলিত। আমার হাত দুটো ধরে বলল, এবারের মত আমাকে বাঁচিয়ে দিন, আমি সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব আপনার কাছে। এর কয়েকদিন পরেই আবার পারমিতা ফোন করল ...।'

প্রবাল কথা শেষ করার আগেই দেবর্ষি চেঁচিয়ে উঠল, 'ছাড়, ওই নৌটঙ্কীর কথা আমার আর শুনতে ইচ্ছে যাচ্ছে না! ছেলেটার কি হল শেষ পর্যন্ত তাই বল।'

দেবর্ষির রাগ দেখে প্রবাল হেসে ফেলল, 'ঠিক আছে, অজয়ের ব্যাপারটাই বলছি। আমি কথাবার্তা বললাম মিঃ সেনের সঙ্গে। গোটা ব্যাপারটাই জানালাম। ভাগ্য ভাল, উনি বুঝলেন ব্যাপারটা। তাছাড়া অজয়ের সার্ভিস-রেকর্ডও কাজে দিল। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা ভেতরে ভেতরে মিটিয়ে ওকে আর একটা সুযোগ দেওয়ার কথা ভাবা হল।'

'বাঃ।' বলে দেবর্ষি মাথা নাড়ল।

'আরে না, বাঃ করার মত কিছু হয়নি। ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল না। মিঃ সেনের সঙ্গে কথা বলে আমি কোম্পানির ডিসিশনটা অজয়কে ডেকে জানিয়ে দিলাম। ছ-মাসের একটা সতর্কীকরণ নোটিশ দেওয়া হল। এই ছ-মাসে ওর পারফরমেন্স দেখে তারপর কোম্পানি যা সিদ্ধান্ত নেবার নেবে। অজয় তো খুব খুশি। আমাকে বার বার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছিল। আমিও বললাম, সব ভুলে গিয়ে নতুন করে শুরু করতে জীবনটাকে। ও মাথা নেড়ে চলে যাচ্ছিল, এইসময় আমি আবার বলব না বলব না করেও ডেকে ফেললাম ওকে। ও একটু অবাক হলেও কিছু বলল না। আমি বসতে বললাম। তারপর গম্ভীর গলায় বললাম, আশা করি, ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছ, কীভাবে এটা সম্ভব হল? ও মাথা নিচু করে বলল, হ্যাঁ, আমি মনে রাখব। আবার বলছি, আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আমি বললাম, কৃতজ্ঞতা জিনিসটা আমার কাছে আরও মূল্যবান মনে হবে যদি তুমি এটা কাজে প্রমাণ করতে পারো। ও একইরকম গলায় বলল, আমি কথা দিচ্ছি, এই ছ'মাস আমি মন দিয়ে কাজ করব। এইসময় অজয় একটা নতুন কথা বলল, ও শুনেছে কিছুদিন যাবৎ প্রোডাকশন হ্যাম্পার করছে। ওর ধারণা কেউ বা কারা সাবোতাজ করতে চাইছে। আমি ব্যাপারটা জানতাম। কিন্তু ওর কাছে সেটা প্রকাশ করলাম না। অজয় বলল, আমি অনুমতি দিলে ও পারচেজ-এর কাজ সামলে ফ্যাক্টরির কাজকর্মও দেখাশোনা করতে পারে। কারণ ওখানে কি ঘটছে সে সম্বন্ধে ওর নাকি একটা আন্দাজ

আছে। ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে জানাল, এ ব্যাপারে অনেক রাঘব-বোয়ালও যে জড়িয়ে আছে, সে সম্বন্ধে ও নিশ্চিত। আমি ওকে তক্ষুনি কিছু বললাম না, তবে ব্যাপারটা ভেবে দেখব এটুকু জানালাম। এইসময় জিজ্ঞাসা করলাম, অ্যান্ড হোয়াট অ্যাবাউট পারমিতা? ওর ব্যাপারটা নিয়ে কি ভাবছ? অজয়ের মুখটা আবার অন্যরকম হয়ে গেল।'

'বলিস কি? তখনও? এ কি জিনিস রে!' দেবর্ষি অবাক গলায় বলে।

প্রবাল হাসে, 'সারা জীবন সাঁতার কেটেই তো বেড়ালে, ডুব আর দিলে কই! প্রেমে তো পড়োনি, তাই আর বুঝবে কি করে বলো এসব?'

'ও বাবা! তার মানে কি বলতে চাইছিস তুই? পিরীতি কাঁঠালের আঠা, লাগলে আর ছাড়ে না! ওসব আমার দ্বারা হবে না গুরু। পড়ত এসব মেয়ে আমার পাল্লায়, ঘুঘুকে ফাঁদ দেখিয়ে ছেড়ে দিতাম। যাই হোক, তোমার ওই পুতুপুতু প্রেমিক-প্রবরটি কি বললেন?'

'বলল, পারমিতার সঙ্গে নাকি অনেকদিন দেখা হয়নি। এখন ও বুঝতে পারছে যে, ওরা দুজনে বোধহয় এক পথের পথিক নয়।'

'যাক, বোধোদয় হয়েছিল তাহলে!' দেবর্ষি ফুট কাটল।

'আমি তখন বললাম, দ্যাখো অজয়, আমাকে স্বীকার করতেই হবে, তোমার মত একনিষ্ঠ প্রেমিক আমি খুব কম দেখেছি। কিন্তু তোমার বোধহয় একটা জায়গায় ভুল হয়ে গিয়েছিল—মেয়েদের কাছে কখনোই নিজেকে অতটা এক্সপোজ করতে নেই, এতে ওরা পেয়ে বসে। এক ধরনের খেলা খেলতে শুরু করে। তুমি তারই শিকার হয়েছিলে। সব মেয়ে নিশ্চয়ই এরকম নয়। তবে তুমি যার সঙ্গে মিশছ তাকে তোমার আর একটু আগেই বোঝা উচিত ছিল। মেয়েরা কেমন পুরুষ পছন্দ করে জানো? যারা আপাত দৃঢ়, প্রেম থাকলেও ভরপুর ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যাদের কাছে ধাক্কা খেয়ে ওরা ফিরে আসে, তাদেরকেই পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। পুরোটা পেয়ে গেলে ব্যাপারটা ওদের কাছে জোলো হয়ে যায়। আমি থামতেই অজয় মাথা নাড়ল। তারপর অন্যরকম গলায় বলল, ঠিক বলেছেন। কিছু মনে করবেন না, এই ব্যাপারটাই এখন ঘটছে আপনার ক্ষেত্রে। আপনি যত পারমিতাকে রিফিউজ করছেন, তত ও অস্থির হয়ে উঠছে।'

'সে কি রে। ও বলল এরকম করে?' দেবর্ষি অবাক, 'তুই কি বললি?'

'কি আর বলব! অস্বস্তি লাগলেও সেটাকে গুরুত্ব না দিয়ে অন্যকথায় চলে গেলাম। অজয়ও আর ওই নিয়ে কথা বাড়াল না।' প্রবাল মাথা নাড়ল।

'কিন্তু পারমিতা কি সত্যিই তোকে পাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল নাকি?'

প্রবাল হাসে, 'তুই তো শুনতেই চাইছিস না ওর কথা!'

'না না, এবার বল। আসলে অজয়ের ব্যাপারটা নিয়ে কীরকম টেনশন হচ্ছিল!'

'পারমিতা এর মধ্যে একদিন আমার ফ্ল্যাটে এসে হাজির হয়েছিল।'

'মাই গুডনেস!' দেবর্ষি চোখ বড় বড় করে।

'একদিন আমি অফিস বেরোব বলে তৈরি হচ্ছি, এমন সময় বেল বাজল। অফিসের পিওনগুলো অনেকসময় আসে, আমার গাড়িতেই অফিসে চলে যায়। আমি ভাবলাম সেইরকমই কিছু। দরজা খুলে তো হাঁ। দেখি পারমিতা দাঁড়িয়ে। ভেতরে আসতে বললাম। এসে বসল। আমি কি বলব বুঝতে পারছিলাম না। পারমিতা কিছুক্ষণ

চুপ করে বসে রইল তারপর সরাসরি জিজ্ঞেস করল, কি ঠিক করলে? আমি আর কি বলব এর উত্তরে। চুপ করে রইলাম। ও তখন বলল, 'মন্দিরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে দুনিয়ার সব মেয়েই তোমার কাছে খারাপ হয়ে গেল? নাকি আমার ব্যাপারেই তোমার আপত্তি? আমি আর থাকতে না পেরে বলে দিলাম, মেয়েদের সম্বন্ধেই আমার ধারণাটা খারাপ হয়ে গেছে। আর তোমাকেও এর ব্যতিক্রম ভাবতে পারছি না আমি। ও বলল, কারণটা জানতে পারি কি? আমি সরাসরিই বললাম, অজয়ের সঙ্গে তুমি যা ব্যবহার করেছ, তাতে তোমাকে আলাদা ভাবার তো কোনও কারণ দেখছি না।'

'তুই বললি এ কথা?' দেবর্ষি লাফিয়ে উঠল প্রায়।

'হ্যাঁ না বলার কি আছে? আর আমিও তো বুঝতে পারছিলাম না পারমিতা হঠাৎ করে হাত ধুয়ে আমার পেছনে কেন লেগে পড়েছে?'

'কি বলল ও?'

'অজয়কে পছন্দ না করার অনেকগুলো কারণ দেখাল। আর সব থেকে বড় কারণ তার মধ্যে যে, আমাকে দেখার পর থেকে ও নাকি আমাকে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না! আমার কাছ থেকে ওর কিছু চাওয়ার নেই—কিন্তু আমাকে ও ভীষণ ভালবাসে, এই ব্যাপারটা থেকে ও বেরোতে পারছে না।'

'কেয়া বাত! তারপর?'

'আমি দেখলাম অযথা একটা মেয়েকে অপমান করার কোনও মানে হয় না, বিশেষত আমার বাড়িতে ও তখন গেস্ট, আমি শান্ত গলায় ওকে বোঝালাম, এসব ব্যাপারে আমি আদৌ ইন্টারেস্টেড নই। প্রেম-ভালোবাসা-বিয়ে এসব নিয়ে আমি ভাবতেও চাই না। শুধু ও বলেই নয়, আমি কোনও মেয়েকেই আর বিশ্বাস করতে ভরসা পাই না। তবে ও যদি আমার বন্ধু হিসেবে থাকতে চায়—আমার কোনও আপত্তি নেই। বন্ধু হয়েও তো আর একজনকে শেয়ার করা যায়, তার পাশে থাকা যায়। এর বেশি জড়াতে আমি রাজি নই। পারমিতা মন দিয়ে শুনল কথাগুলো। হয়তো বা বুঝলও। কারণ তারপরে এ নিয়ে আর জোর করল না। তবে ও যে আমাকে ওর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুই ভাবে, সে কথা আবার জানিয়ে দিল। ব্যস, সেদিন থেকে আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম। যদিও বুঝতাম অদ্ভুত একটা অধিকারবোধ ও মাঝেমধ্যে দেখাতে চাইত, কিন্তু আমি সেসবে গুরুত্ব দিতাম না।'

'যাক বাবা, বাঁচালি! আমি তো ভয় পাচ্ছিলাম, তুই বুঝি আবার ফেঁসেছিলি!' দেবর্ষি বলল।

প্রবাল মাথা নাড়ল, 'তবে পারমিতা আমার একটা উপকার করেছিল। যোগাযোগটা অদ্ভুত হলেও স্বীকার করতে হবে এতে পারমিতারই অবদান বেশি। যদিও পরিণতি শেষ অবধি ভাল হয়নি।'

'পারমিতা আর উপকার—দুটো একসঙ্গে ঘটল কি করে?'

প্রবাল হাসে, 'না রে, সত্যিই ব্যাপারটা ঘটেছিল। ওই তখন বললাম না, আমার বস বিপিন কুণ্ডুর প্যাশনের কথা!'

'ওই আর্ট!' দেবর্ষি মাথা নাড়ল।

'হ্যাঁ। আমার ওখান থেকে বেরিয়ে পারমিতা সেদিন ওর এক বান্ধবীর বাড়িতে

যাবে বলেছিল। ঠিক হল অফিস যাওয়ার পথে আমি ওকে নামিয়ে দেব। কথায় কথায় জানতে পারলাম ওর বান্ধবীর নাম সোহিনী। সোহিনী সিন্‌হা, আর্ট কলেজের ছাত্রী ছিল। তারপর পুরোদমে ছবি আঁকছে। কয়েকটা এক্‌জিবিশনও করেছে। শুনেই আমার বি. কে.-র কথাটা মনে পড়ল। পারমিতাকে বললাম সে কথা। পুরোটা শুনে পারমিতাও উৎসাহী হল। জানাল সোহিনীও চাইছিল, যদি স্পনসর পেত তাহলে কলকাতার বাইরেও কয়েকটা প্রদর্শনী করত, কারণ দিল্লি, বম্বে সাইডে ছবির বাজারটা নাকি ভাল। ঠিক হল একদিন ও আমাকে সোহিনীর বাড়িতে নিয়ে যাবে। এর মধ্যে সোহিনীর সঙ্গে কথা বলে ফোনে আমাকে জানিয়ে দেবে।'

'ও, এই ব্যাপার! আমি ভাবলাম কি উপকার করল আবার পারমিতা!'

'না রে, ওই সোহিনী সিন্‌হার কেসটা খুব স্যাড। একদম অন্যরকম ছিল মেয়েটা। শিল্পী বলেই কিনা জানি না, ওর ভাবনাচিন্তার পরিধি, চিন্তার গভীরতা অসম্ভব ভাল ছিল। সব থেকে বড় কথা একটা নরম মনের অধিকারী ছিল—যেটা সচরাচর এখন আর পাওয়া যায় না। পারমিতার একেবারে বিপরীত ক্যারেকটার। পারমিতা যেমন প্রতিটা স্টেপ ফেলত মেপে মেপে, সোহিনী ছিল তেমনই বেহিসেবী, আবেগপ্রবণ! কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট!'

এইসময় ঘড়ির দিকে নজর পড়তে চমকে উঠে বসেছিল প্রবাল। দুপুর গড়িয়ে গেছে গল্পে গল্পে। খিদেটা তখন অনুভব করেছিল। দুই বন্ধুতে মিলে খাওয়া-দাওয়া সারতে সারতে প্রায় বিকেল হয়ে গিয়েছিল। এখনও মনে পড়লে প্রবালের বেশ ভাল লাগে। দারুণ কেটেছিল দিনটা। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিল—পেশাগতভাবে দারুণ সাফল্যলাভ করলেও দেবর্ষির মনে কোনও অহমিকাবোধ জন্মায়নি। আগের মতই খোলামেলা—সহজ আচার-আচরণ। প্রবাল মেকি হাসি-তৈরি-ব্যবহার মাপা কথাবার্তা শুনে শুনে যন্ত্রের মত হয়ে গিয়েছিল। সে নিজেও অনেকটা ওই ছাঁচেই নিজেকে তৈরি করে ফেলেছিল। পারমিতাকে ফিরিয়ে দেওয়ার পিছনে এও একটা মস্ত বড় কারণ ছিল। নিজের মধ্যেকার সেই কোমল ব্যাপারটাই সে আর অনুভব করতে পারত না। কিন্তু সোহিনীকে দেখে প্রবাল তার এই কাঠিন্যে ফাটল অনুভব করেছিল। অদ্ভুত নিষ্পাপ, কোমল মেয়ে ছিল সোহিনী। যেন এই বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে কোনও ধ্যানধারণাই তার ছিল না। অন্য গ্রহের, অন্য জগতের বাসিন্দা ছিল সে। যে গ্রহে তখনও পাপের প্রবেশ ঘটেনি, মিথ্যের সৃষ্টি হয়নি, ঈর্ষা জন্ম নেয়নি। কখন যেন চোরাপথে প্রবালের মধ্যে ঢুকে গেছিল সোহিনী। হঠাৎ কোনও সন্ধ্যেয়, নির্জন রাত্তিরে অথবা নিরালা দুপুরে প্রবাল তার নরম উপস্থিতি টের পেত। কিন্তু জানান দিত না। প্রবাল নিজেকেও অনেকবার আয়নার সামনে দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু সঠিক কোনও প্রতিফলন দেখতে পায়নি। সবটাই ছিল কেমন ধোঁয়া-ধোঁয়া, ঘোলাটে। সোহিনীর মন প্রবাল প্রথমে বুঝতে পারত না। ওর ব্যবহারে অদ্ভুত একটা সাবলীলতা ছিল। কিন্তু প্রবাল লক্ষ্য করেছিল, সোহিনী প্রত্যেকের সঙ্গেই একইরকম সাবলীল। নরম, লাজুক, কিন্তু জড়তাহীন। প্রবাল তাই দ্বিধায় ছিল। তাছাড়া নিজেকে জানার জন্যও সময় নিচ্ছিল। কিন্তু এবারও কপট হাসি হেসেছিল প্রবালের ভাগ্য। সময় নিতে গিয়ে অনেকটাই দেরি করে ফেলেছিল প্রবাল। নিজের কাছে যখন উত্তর পেয়ে গিয়েছিল, তখন বি.কে. গ্রাস করে ফেলেছে সোহিনীকে! সেই সুন্দর

গ্রহটার ওপর গ্রহণের কালো ছায়া। ধীরে ধীরে বি.কে.-র অন্য রূপটা দেখেছিল প্রবাল। কি শীতল মস্তিষ্কের অধিকারী আর কি অসম্ভব রকমের অভিজ্ঞ! এরকম ধুরন্ধর লোক আজ পর্যন্ত কমই দেখেছে প্রবাল। গ্রহণ আর কাটেনি। বি.কে.-র কবল থেকে সোহিনীকে মুক্ত করতে পারেনি প্রবাল, এমনকি পারমিতাও। সোহিনীর প্রতি দুর্বলতাকে যতই আড়াল করে রাখুক, পারমিতার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি প্রবাল। ঈর্ষার বশে পারমিতা সোহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করে ফেলেছিল প্রায়। অথচ প্রবাল কোনদিনই মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলেনি। সত্যিই ঈশ্বর মহিলাদের অসাধারণ কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন। তবে প্রথমদিকে জেলাস হলেও পারমিতা পরিস্থিতি বুঝে প্রচুর চেষ্টা করেছিল সোহিনীকে বোঝাতে। এমনকি বি.কে.-র মিসেস লাবণ্যদেবীর কাছেও গিয়েছিল নিজেই উদ্যোগ নিয়ে। কিন্তু কেউই বোধহয় কারও ভাগ্যকে পালটাতে পারে না। এই একটা জায়গায় মানুষ বাববার হেরে যায়। আর এই ভাগ্যের হাতেই প্রবাল মার খাচ্ছে বারংবার।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিল ওরা। প্রবালের ফ্ল্যাটটা সাত-তলায়। এত উঁচু থেকে কলকাতাকে দেখতে ভালই লাগে প্রবালের। তাছাড়া চারপাশটা অপেক্ষাকৃত খোলামেলা এখানে। পাশেই একটা পার্ক আছে। কাছাকাছি ফ্ল্যাটের বাচ্চারা সেখানে খেলতে আসে। সঙ্গে তাদের বাচ্চা-বাচ্চা মায়েরাও আসে পাহারা দেবার নাম করে একটু মেয়েলি আড্ডা দিতে। প্রবাল এইসব মায়েদের লক্ষ্য করে দেখেছে। এরা অনেক আধুনিক। এদের গায়ে বা চেহারায় যেন সেই পরিচিত মা-এর রূপটা ধরা পড়ে না। বয়সও বেশি না হওয়ায় একধরনের উচ্ছলতা চোখে পড়ে আচার-আচরণে। রবিবার বাড়িতে থাকলে প্রবাল ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে অনেকসময় এদের লক্ষ্য করে। মাঝেসাঝে সেও কখনও পার্কে যায়। ওইসব মায়েরা তখন চোখের কোণ দিয়ে তাকে দেখে, হয়তো বা নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনাও করে। প্রবাল এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। তবে মেয়েলি আড্ডার বিষয় হতে পেরে মনে মনে বেশ ভালই লাগে তার।

সিগারেট টানতে টানতে টুকটাক গল্প হচ্ছিল দুই বন্ধুর। ঘরে আরও পানীয় মজুত থাকায় ঠিক হয়েছে দেবর্ষি সে-রাতে প্রবালের ফ্ল্যাটেই থেকে যাবে। সন্ধে থেকে সেসব নিয়ে বসার প্ল্যান আছে। তার আগে আলগা গল্প হচ্ছিল। দেবর্ষির হৃদ্যতা প্রবালের ভাল লাগছিল। জীবনের যেসব ঘটনা কাউকে কোনদিন বলতে পারেনি, আজ অনায়াসে সেসব দেবর্ষিকে বলে যাচ্ছিল। সেই কলেজের দিনগুলোর উষ্ণতা আজ ফিরে এসেছিল প্রবালের ফ্ল্যাটে। সোহিনীর কথা মনে হওয়ার পর থেকেই একটু আনমনা হয়ে গিয়েছিল প্রবাল। দেবর্ষি সেটা খেয়াল করেছিল। নিজের ফিল্ম সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলার পর দেবর্ষি প্রবালকে জিজ্ঞেস করল, 'তখন কি একটা বললি, সেই আর্টিস্ট মেয়েটির কথা—খুব স্যাড ব্যাপার—কি হয়েছিল?'

সিগারেটের ধোঁয়ায় রিং তৈরি করছিল প্রবাল। খুব সুন্দরভাবে রিংগুলো তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু কেউই নিজের অবস্থানে স্থির থাকছিল না। দ্রুত বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছিল কুণ্ডলী ছাড়তে ছাড়তে। প্রবাল একমনে সেটা লক্ষ্য করছিল। যে নির্দিষ্ট জীবনবৃত্তে প্রবাল চক্রাকারে ঘুরে যাচ্ছে, সেখানেও কেউ আটকে রইল না। বাবা-মা, দাদা-বোন যাদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক তারাও নয়, আবার যে অদ্ভুত রসায়নে ভিন্ন জগতের দুটি মানুষ সারাজীবন একসঙ্গে থেকে যায় সেরকম কেউও এল না। প্রবালের এই চুপ করে

থাকাটাকে প্রশ্রয় দিল দেবর্ষি। তবে অন্যমনস্কতা কাটিয়ে নিজেই কথা শুরু করল প্রবাল, 'সোহিনীর ব্যাপারটা সত্যিই স্যাড! মেয়েটার ট্যালেন্ট ছিল, কিন্তু এত বেশিমাত্রায় আবেগপ্রবণ—ওটাই ওকে শেষ করে দিল।'

দেবর্ষি ভুরু কুঁচকে বলল, 'বারবার শেষ করে দিল, শেষ করে দিল, কথাটা বলছিস কেন—মেয়েটি এখন কোথায়?'

প্রবাল হেসে মাথা নাড়ল, 'তোর আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে—এমন এক জায়গায় যেখান থেকে ওকে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা আমাদের কারও নেই।'

'মাই গড! সে কি?'

'সোহিনী শেষ অবধি সুইসাইড করেছিল। বেচারি বুঝতে পারেনি, ওর এভাবে চলে যাওয়াতে কারও কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। কাউকে কোনভাবে প্রভাবিত করতে পারবে না। সময় ওর অস্তিত্বকে ধীরে ধীরে মুছে ফেলবে। তবে হ্যাঁ, কারও কারও মনে হয়তো বা দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে রেখে গেছে, কিন্তু তাতেই বা কি এসে যায়!'

'কি করে ঘটেছিল ঘটনাটা? আই মীন, কেন ও সুইসাইড করল?' দেবর্ষি জানতে চাইল।

'ক্রমাগত টানাপোড়েনে জেরবার হয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। তাছাড়া এমনভাবে প্যাঁচে জড়িয়ে পড়েছিল, তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিল না। সে সময় সবাই ওর ওপর বিরক্তও হয়ে উঠেছিল। ফলে কারও সঙ্গে খোলামেলা কথাও বলতে পারত না। শেষের দিকে নিজেব ভুল বুঝতে পারলেও এই মানসিক সাহচর্য না পাওয়াটা ওকে পর্যুদস্ত করে তুলেছিল।'

'তুই কি বি.কে.-র সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলি?'

প্রবাল মাথা ঝাঁকাল, 'হ্যাঁ। আর এখন সেটার জন্য সব থেকে বেশি আফসোস হয় আমার। মাঝেমাঝে মনে হয় মেয়েটার এইভাবে চলে যাওয়ার পিছনে আমারও বোধহয় কিছু দায় রয়ে গেছে। কিন্তু তখনও তো আমি বি.কে.-র এই রূপটার সঙ্গে পরিচিত নই। একেবারে অক্টোপাস!'

'কেসটা কী হয়েছিল?' দেবর্ষি আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল।

'পারমিতা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিক্সড করেছিল। ওর সঙ্গেই আমি একদিন গি'য়েছিলাম সোহিনীর বাড়ি। প্রথম দেখাতেই মেয়েটাকে আমার ভাল লেগেছিল। আমি যদিও আর্টের কিছু বুঝি না, তবে এটুকু বুঝেছিলাম মেয়েটার ধ্যান-জ্ঞান-জীবন পুরোটাই ছবির জগৎকে নিয়ে। টুকটাক কথার পর আমি বি কে.-র প্রসঙ্গ তুললাম। বললাম, উনি ছবির ব্যাপারে ভীষণ ইন্টারেস্টেড। শুধু তাই নয়, প্রতিভাবান শিল্পীদের সাহায্য করতেও উৎসুক। কথাটা শুনে কিন্তু তেমন উৎসাহ দেখাল না সোহিনী। খুব নিস্পৃহভাবে মাথা নেড়ে জিজ্ঞাসা করল, কি ধরনের সাহায্য করতে চান উনি? আমি যেটুকু জানি সেটুকুই বললাম, কলকাতার বাইরে বম্বে, দিল্লি, ব্যাঙ্গালোরে উনি এক্সিবিশন অর্গানাইজ করতে সাহায্য করেন। এছাড়া ছবি বিক্রির ব্যাপারেও উনি হেল্প করেন, কারণ এইধরনের প্রচুর লোকজনের সঙ্গে ওঁর জানাশোনা আছে। সোহিনী শুনে একইরকম গলায় বলল, এতে ওঁর কি ইন্টারেস্ট, মানে কি লাভ? আমি জানালাম, আর্ট হল ওঁর ভাললাগার জায়গা। অন্যান্য কাজের ফাঁকে এটা বোধহয় ওঁকে আলাদা আনন্দ দেয়। কিছুটা নেশাও বলতে

পারেন। সব শুনে সোহিনী কিছুক্ষণ ভাবল। বি.কে.-র সম্বন্ধে আরও দু-একটা টুকটাক কথা জানতে চাইল। আমি যতটা জানি বললাম। ঠিক হল, ও আর পারমিতা একদিন আমার অফিসে চলে আসবে। আমরা তিনজন একসঙ্গে বি.কে.-র বাড়িতে যাব। এর মধ্যে যাবতীয় কথাবার্তা বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট তৈরি করে রাখার কাজটা আমি সেরে রাখব। সেদিন ওই পর্যন্তই। সোহিনীর মায়ের সঙ্গেও আলাপ হল। আমাদের জন্য চা-খাবার-দাবার নিয়ে এসেছিলেন। একেবারেই আটপৌরে সংসারী মহিলা। তবে বেশ ভাল। আমি পরদিন অফিসে এসে বি.কে.-কে ফোনে পুরো ব্যাপারটা জানালাম। উনি তো তক্ষুনি রাজি। পরদিনই অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিক্সড্ হল। সেইমত সোহিনী আর পারমিতা আমার অফিসে চলে এল। সন্ধে সাতটায় দেখা করার কথা ছিল, আমরা ঠিক সময়ে পৌঁছে গেলাম বি.কে.-র বাংলোয়। সোহিনীকে দেখে বুঝতে পারছিলাম ও একটু টেনশন করছে। বিশেষ করে পারমিতা আরও ইন্ধন জোগাচ্ছে।'

দেবর্ষি চুপচাপ প্রবালের কথা শুনছিল, এই সময় বলে উঠল, 'ইন্ধন জোগাচ্ছে মানে?'

'ওই আর কি! বি.কে.-র বয়সী পুরুষমানুষকে চট করে বিশ্বাস করা উচিত নয়। বিশেষ করে যদি টাকাপয়সার কোনও অভাব না থাকে, তাহলে এরা নাকি ডেঞ্জারাস হয়, এসব বলে যাচ্ছিল!'

'সে কি রে! ওর ঘরে বসে ওরই সমালোচনা!' দেবর্ষি মন্তব্য করল।

'হ্যাঁ। তারপর বলল, ভাল করে যাচাই না করে কখনোই ওর প্রস্তাবে রাজি না হতে। আগে বুঝতে হবে লোকটার আসল উদ্দেশ্য কি, মানে বিউটির পিছনে কোনও বীস্ট লুকিয়ে আছে কিনা! এইসব। সোহিনী এসব শুনে আরও ঘাবড়ে যাচ্ছিল। আমি ওকে তখন আশ্বস্ত করলেও এখন বুঝতে পারি পারমিতা ভুল কিছু বলেনি, সত্যি বলতে কি, তখন পারমিতার ওই সব কথাবার্তা আমার ভাল লাগছিল না। বিরক্ত লাগছিল একটু। কিন্তু ওই যে বলে না, কোনও কোনও মেয়েদের সিক্সথ্ সেন্স সাংঘাতিক প্রখর হয়—পারমিতা সেই ধাতের মেয়ে। সোহিনী যেহেতু একটু নরম স্বভাবের তাই ওকে ও সাবধান করছিল। যাইহোক, বি.কে. বোধহয় ভেতরে কোনও জরুরি টেলিফোনে ব্যস্ত ছিলেন, প্রায় মিনিট পনেরো অপেক্ষার পর বেরিয়ে এলেন। পরিচয়-পর্বের পর কথাবার্তা শুরু হল। বি.কে. বেশ চমক দিয়ে শুরু করলেন। সোহিনীকে প্রায় ইন্টারভিউয়ের ঢঙে প্রশ্ন করতে লাগলেন।'

'কীরকম?' দেবর্ষি জানতে চাইল।

'এখন আর ঠিক ঠিক মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে, সোহিনীর সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য একজায়গায় করার চেষ্টা করছিলেন। সোহিনীও উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল একের পর এক।' প্রবাল একটু মনে করার চেষ্টা করল চোখ বন্ধ করে। দেবর্ষি বন্ধুর এই ইনভলভমেন্টটা লক্ষ্য করছিল। প্রবাল একটু পরে মাথা নাড়ল, 'তোকে আমি ওদের কথাবার্তার মোটামুটি একটা আইডিয়া দিচ্ছি। আমি বি.কে.-কে বললাম, স্যার, সোহিনী খুব ভাল ছবি আঁকে।'

বি.কে. সঙ্গে সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করলেন, উঁহু, যে ছবির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক তৈরি করেনি, তার মতামত গ্রহণ করা যায়না। কি বলো সোহিনী?

সোহিনী মাথা নেড়ে বলল, ঠিক বলেছেন। আমি চেষ্টা করি এটুকু বলাই ভাল।

গুড। প্রতিভাবান মানুষ মাত্রেই বিনয়ী হয়। তুমি কি আর্ট কলেজের ছাত্রী?

সোহিনী মাথা নাড়ল।

এক্‌জিবিশন করেছ? বি.কে. জানতে চাইলেন।

সোহিনী বলল, বন্ধুদের সঙ্গে একসঙ্গে দু-একটা করেছি। কাগজে তার রিপোর্টও বেরিয়েছে।

বি.কে. মাথা নেড়ে বললেন, কাগজের রিপোর্ট থেকে আমি নিজের চোখকেই বেশি বিশ্বাস করি। আচ্ছা, সমসাময়িক আর্টিস্টদের মধ্যে কার আঁকা তোমার বেশি ভাল লাগে?

সোহিনী একটু চিন্তা করে বলল, গণেশ পাইন, গণেশ হালুই, শ্যামল দত্ত রায়—।

বি.কে.-র কপালে ভাঁজ, বিকাশ ভট্টাচার্য?

ভাল লাগে, কিন্তু—, সোহিনী কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল।

কিন্তু কি? বি.কে. জানতে চাইলেন।

ওঁর ছবিতে যেন বড্ড বেশি গল্প থাকে! সোহিনী মুখ নামিয়ে বলল।

ছবিতে গল্প তো থাকবেই। সেই গল্প দর্শক নিজে তৈরি করে নেবে। ওঁর দুর্গা সিরিজের ছবিগুলো তো অনবদ্য। আচ্ছা, তুমি বিদেশী ছবি দেখেছ?

সোহিনী মাথা নাড়ল, প্রিন্ট দেখেছি।

সে তো বটেই! অরিজিনাল আর দেখবে কেমন করে? আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার আঁকা সম্বন্ধে। তুমি যখন ছবি আঁকো, তখন কি আগে থেকে মনে মনে কম্পোজ করে নাও, নাকি আঁকতে আঁকতে ডেভেলপ করো?

সোহিনী এবার একটুও না ভেবে বলল, একটা বেসিক হুক মাথায় থাকলেও সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। আঁকতে আঁকতে ছবি যেমন ডিমান্ড করে, তেমনই আঁকি।

বিদেশে কখনও গিয়েছ?

'না।' সোহিনী দুদিকে ঘাড় নাড়ে।

ঠিক আছে, তোমার ছবিগুলো একদিন দেখতে চাই। বি.কে. বললেন।

সোহিনী তখন বলল, সেক্ষেত্রে আপনাকে তো আমার বাড়ি যেতে হবে'

বি.কে. শরীর দোলালেন, ভাল ছবি দেখার জন্যে দরকার হলে আমি পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পর্যন্ত যেতে রাজি আছি। কবে যাব বলো।

সোহিনী অল্প হেসে বলল, আপনি যেদিন যেতে চাইবেন—আমার কোনও অসুবিধে নেই। তাছাড়া আমার অন্য কোনও ব্যস্ততাও নেই, বেশিরভাগ সময়টাই আমার স্টুডিওতেই কেটে যায়।

ওয়েল, তুমি তাহলে আমাকে তোমার ফোন নম্বরটা দিয়ে রাখো। আই উইল কন্ট্যাক্ট ইউ। বি.কে. বললেন।

সোহিনী ব্যাগ থেকে একটুকরো কাগজ আর পেন বার করে তাতে ওর বাড়ির নম্বর লিখে দিল। বি.কে. সেটা হাতে নিয়ে চোখ বুলিয়ে বললেন, তোমার বাড়িতে কে কে আছেন?

সোহিনী জানাল, আমি আর মা। বাবা মিলিটারিতে ছিলেন। মারা গেছেন। ব্যাস,

আর কেউ নেই।

'আচ্ছা—', বি.কে. মাথা নাড়লেন।

সোহিনী মুখ নামিয়ে বসে রইল। এইসময় পারমিতা আবার মুখ খুলল। সরাসরি বি.কে.-কে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, আপনি তো দেশে-বিদেশে প্রচুর ছবি দেখেছেন, আপনার কি মনে হয় একজন মানুষ, মানে একজন শিল্পী মনে মনে যা ভাবে, তা সত্যি সত্যি ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে পারে?

বি.কে. পারমিতার দিকে তাকালেন, কেউ কেউ পারে—অবশ্যই সকলে নয়। পিকাসোকে নিয়ে একটা গল্প চালু আছে, জানো কি? প্রশ্নটা করে বি.কে. একবার পারমিতা, একবার সোহিনীর দিকে তাকালেন। ওরা দুজনেই হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঘাড় নাড়ল। বি.কে. তখন বলতে লাগলেন, পিকাসো খুব মুডি ছিলেন। মনখারাপ হলে মাঝে মাঝে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দরজা বন্ধ করে থাকতেন। তখন ওঁর খাবার জানলার একটা ফাঁক গলিয়ে দেওয়া হত। বন্ধ ঘরে পিকাসো কি করছেন, এ নিয়ে সকলের খুব কৌতূহল ছিল। একজন ফটোগ্রাফার তো ছিনে-জোঁকের মত লেগে গেলেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করে একটা গর্ত আবিষ্কার করে তার ভেতর দিয়ে ছবি তুলবার চেষ্টা করলেন। দেখা গেল পিকাসো দাঁড়িয়ে আছেন ঘরের মাঝখানে। হাতে মশাল। সেই মশাল দিয়ে যেন শূন্যে ছবি আঁকছেন। মশালের আগুন তাঁর তুলি। ছবিগুলোর যখন প্রিন্ট হল তখন আগুনের এক-একটি ভঙ্গি, হাতে আঁকা ছবির চেয়েও দারুণ অর্থবহ বলে মনে হল অনেকের। ভাবলেই রোমাঞ্চিত হতে হয়!

বি.কে.-র কথা শেষ হলে পারমিতা প্রশ্ন করল, প্রবালের কাছে শুনলাম আপনি নতুন শিল্পীকে প্রমোট করতে চান, কেন?

বি.কে. এইধরনের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তবে অসম্ভব দ্রুত ব্যাপারটা সামলে নিয়ে বললেন, কাউকে-না-কাউকে এই কাজটা করতে হয়, তাই না?

পারমিতা অনেকটা জেরার ভঙ্গিতে বলল, আপনার স্বার্থ কি?

বি.কে. স্পষ্ট চোখে তাকালেন পারমিতার দিকে, তাবপর বললেন, ইতিহাসে যে সমস্ত রাজারা শিল্পীদের সুযোগ করে দিয়েছেন, তাদের স্বার্থ কি ছিল?

পারমিতা ঝট করে বলে উঠল, আপনি তাহলে নিজেকে রাজা ভাবেন?

আমি আর থাকতে না পেরে পারমিতাকে থামানোর চেষ্টা করলাম, পারমিতা, প্লীজ!

বি.কে. সামান্য হেসে আমাকে বাধা দিলেন, না প্রবাল, ওর কথাগুলো শুনতে আমার ভাল লাগছে। এসব কথা তো কেউ আমাকে বলে না। তবে সোহিনীর যদি কোনও প্রশ্ন থেকে থাকে, তাহলে তুমিও তা করতে পারো। শেষ কথাগুলো সোহিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন বি.কে.।

এসব কথাবার্তার মাঝে সোহিনী একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। বি.কে.-র কথায় কোনওক্রমে বলল, আমি ভাবছিলাম, আমার ছবি যদি আপনার পছন্দ না হয়, তাহলে কি হবে?

বি.কে. হাসলেন, এখনই সেসব ভাবতে বসেছ? আর ধরো যদি উলটোটা হয়, তাহলে?

তাহলে কি? সোহিনী ভীরু গলায় জানতে চাইল।

তাহলে পৃথিবীটাকে একটা বলের মত বানিয়ে তোমার হাতে তুলে দেব। তোমার াজ হবে ছবি আঁকা আর পৃথিবীতে তোমার নাম ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব আমার। একটু থমে আবার বললেন, দ্যাখো, আমার কোনও কিছুর অভাব নেই। আমি ইচ্ছেমত ীবনটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। কিন্তু তবুও কীসের যেন এক টান অনুভব করি, অদ্ভুত কটা ভাললাগা তৈরি হয় এই ছবির জগতের মধ্যে এলে। বলতে পারো, সেই ালাগার টানেই কাজটা করতে চাই। কিন্তু এসব পরের কথা, আগে তোমার ছবি দখি, তারপর এসব কথা হবে।

সোহিনী মাথা নেড়ে বলল, আমার কেমন যেন নার্ভাস লাগছে এসব শুনে। ঠিক াছে, আজ তাহলে আমরা আসি। আপনি আপনার সময়টা আমাকে জানিয়ে দেবেন, ামি সব রেডি করে রাখব।

ও.কে., বি.কে. সোহিনীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, আশা করি আমরা একসঙ্গে াজ করতে পারব। লেটস্ হোপ—। সোহিনীর সঙ্গে করমর্দনের পর বি.কে. মাথা াকালেন, মানুষ যদি মানুষকে স্পর্শ না করে তাহলে আত্মীয়তা তৈরি হয় না।

সোহিনী একথায় চোখ নামিয়ে লাজুক ভঙ্গিতে বলল, আজ আসি।

আমি সোহিনীর মধ্যে কোথায় যেন একটু দুর্বল ভাব লক্ষ্য করলাম। কেন জানি া, আমার মনে হচ্ছিল পারমিতার নিজেকে নিয়ন্ত্রণের যে ক্ষমতা আছে, সামহাউ সাহিনীর মধ্যে সেটা নেই। ওকে অনায়াসেই কেউ প্রভাবিত করতে পারে। তবে আমার ঙ্গেও সদ্য পরিচয় হয়েছে। কতটুকুই বা জানি ওর সম্বন্ধে। হতেই পারত আমার ্যাসেসমেন্টটা রং। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কিছুদিন পরেই বুঝতে পারলাম, আই ওয়াজ রাইট ন মাই জাজমেন্ট।'

প্রবাল কথাগুলো বলে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। দেবর্ষি মৃদু গলায় বলল, কীরকম?'

'বি.কে. সোহিনীর বাড়িতে যাবেন বললেও আর্জেন্ট একটা মিটিং পড়ে যাওয়ায় াক সপ্তাহের জন্য কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছিলেন। ফিরে এসেও অফিসের াজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এর মধ্যে সোহিনী খোঁজখবর নেবার জন্য আমার অফিসে ফান করল। আমি ব্যাপারটা বললেও ও বোধহয় একটু উদ্বিগ্ন ছিল। বি.কে.-র সঙ্গে াকবার দেখা করতে চাইল। কি ভেবে আমি ওকে অফিসে আসতে বললাম বিকেলের দকে। সেদিন বি.কে. অফিসে ছিলেন। সোহিনীকে আসতে বললেও তখনও অবধি বি.কে.-কে কিছু জানাইনি। দুপুরের দিকে ফাঁক পেয়ে বললাম, সোহিনী দেখা করতে ায়। একটু ব্যস্ত থাকলেও খবরটা পেয়ে বেশ ভালই লাগল বলে মনে হল। সোহিনী াল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। দারুণ লাগছিল ওকে সেদিন। হলুদ রঙের শাড়ি পরেছিল, তার াঙ্গে মিলিয়ে সামান্য কিছু গয়না। বি.কে.-র চেম্বারে ওকে আমিই নিয়ে গেলাম। সাহিনীর সঙ্গে বি.কে. সেদিন অনেক গল্প করেছিলেন। এমনকি নিজের ব্যক্তিগত জীবন, ীর কাজকর্ম এসব কথাও বলছিলেন। আমি নীরব দর্শক ছিলাম। অথবা বলতে পারিস শ্রোতা! বি.কে.-র গলায় সেদিনও আমি অন্য কিছুর ছোঁয়া পেয়েছিলাম। কিন্তু আবার নজেকে বুঝিয়েছিলাম, এত দ্রুত ভুল ভাবার কিছু হয়নি। এভাবেই জল নীচের দিকে ড়াচ্ছিল। আর আমরা কেউই তাকে আটকাতে পারিনি।' প্রবাল আবার ভেঙেপড়া

গলায় বলল।

'সেদিন কি হল?' দেবর্ষি জিজ্ঞাসা করল।

'চেম্বারের বাইরে থেকেই সোহিনী বলল, মে আই কাম ইন স্যার? ব্যাস, বি.কে. চোখ তুলে একেবারে স্থির। সোহিনীকে আপাদমস্তক দেখে দুর্দান্ত একটা হাসি হেসে বললেন, আরে এসো এসো। তোমারই প্রতীক্ষায় বসে আছি।

সোহিনী ভেতরে এসে দাঁড়াল। বি.কে. ওকে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেও ওঁর চোখ সরছিল না সোহিনীর শরীর থেকে। শেষ অবধি বলেই ফেললেন, আজ তোমাকে একেবারে অন্যরকম লাগছে।

সোহিনী একটু অবাক গলায় বলল, অন্যরকম! কীরকম?

বি.কে মাথা নেড়ে বললেন, 'সেটা বললে একটু কাব্য করা হয়ে যাবে। এখন থাক। তবে তুমি এলে বলে ধন্যবাদ।'

ধন্যবাদ কেন? সোহিনী আবার অবাক।

আমার মন ভাল হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

সোহিনী তাড়াতাড়ি কথা ঘোরাল। একবার আমার দিকে চকিতে তাকিয়ে বি.কে.-কে বলল, আমি ভেবেছিলাম আপনি যাবেন আমার বাড়িতে, মানে, আপনি সেইরকমই বলেছিলেন।

ঠিকই ভেবেছিলে। আসলে তাই তো ঠিক ছিল। হঠাৎ একটা জরুরি মিটিং অ্যাটেন্ড করার জন্য আমাকে বাইরে যেতে হল। ফিরে এসে কোম্পানির কিছু ঝামেলায় এমন জড়িয়ে পড়লাম যে সময় বের করাই মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। প্রবাল সব জানে। আসলে আমরা তো তোমার মত লাকি নয়, শিল্পের সঙ্গে সারাদিন বসবাস করার ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। যাকগে, তুমি এসে খুব ভাল করেছ। তোমার সঙ্গে কথা বললেও কিছুক্ষণ ছবির জগতে থাকা যাবে। তার আগে বলো কি খাবে—চা না কোল্ড ড্রিঙ্কস্? বি.কে. চোখ নাচালেন।

সোহিনী মাথা নেড়ে বলল, থ্যাঙ্কস, কিন্তু সবসময় খেতে আমার ভাল লাগে না। সোহিনীর এরকম স্পষ্ট আপত্তিতে বি.কে. প্রথমে একটু থমকালেও সঙ্গে সঙ্গে বললেন, গুড। লোকে চক্ষুলজ্জায় অনেকসময় অনেককিছু মেনে নেয়। তুমি সোজাসুজি বলতে পারলে, এটা ভাল লক্ষণ। বেশিরভাগ বাঙালি মেয়ে এটা পারে না।

সোহিনী এবার বি.কে.-র দিকে তাকাল, তারপর একটু হেসে জিজ্ঞেস করল, আপনি তো বেশিরভাগ সময়টা বিদেশেই থাকেন, তাহলে বাঙালি মেয়েদের সম্বন্ধে এত জোর দিয়ে কথা বলছেন কি করে?

কারণ আমি বাঙালী। আর আমার যৌবনকালটা বাঙালী মেয়েদের সঙ্গেই কেটেছে। বিদেশে তো গেছি তার পরে। বি.কে. একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর? তোমার বান্ধবী পারমিতার খবর কি?

সোহিনী একটু আমতা আমতা স্বরে বলল, ভাল। আসলে ওর সঙ্গে সেরকম রেগুলার যোগাযোগ থাকে না। তাছাড়া ও আমার ছবির জগতের বন্ধু ঠিক নয়।

হুঁ, সেটা আমি বুঝতেই পেরেছিলাম। শিল্পীদের মন অত আগুপিছু ভাবে না। তাছাড়া ও আমার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় বলেই বোধহয় একটু অবিশ্বাস—

বি.কে. কথা শেষ করার আগেই সোহিনী বলে ওঠে, আই অ্যাম সরি। সেদিন ওর ওভাবে বলা ঠিক হয়নি। ইনফ্যাক্ট পারমিতা প্রবালবাবুরও বন্ধু বলে আমি ওকে সেভাবে কিছু বলতে পারিনি।

না, না, ঠিক আছে। আমি কিছু মনে করিনি। বুদ্ধিমানেরাই তো যাচাই করে! তারপর বলো, এখন কি ছবি আঁকছ?

সোহিনী একটু ভেবে বলল, আসলে গত কয়েকদিন অনেকগুলো বিষয় মাথায় ঘুরছে, কিন্তু এক জায়গায় আনতে পারছি না সেগুলোকে। ফলে একটু ডিস্টার্বড্ আছি। আসলে আমার এরকম হয়। ভাবনাগুলো যেন ভেসে ভেসে বেড়ায়। কিন্তু যতক্ষণ না তাদের ক্যানভাসে জড়ো করতে পারছি, শান্তি পাই না। কি যে কষ্টের এই সময়টা। সোহিনীর মুখে যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট।

বি.কে. সেটা লক্ষ্য করে বললেন, তুমি মিস্টার ক্লাইনের নাম শুনেছ?

সোহিনী মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

তোমার কথা শুনে আমার ক্লাইনের কথা মনে পড়ে গেল। ভদ্রলোক ছবি আঁকতেন। ছবিই ছিল ওঁর ধ্যান-জ্ঞান। কিন্তু তেমনভাবে বিখ্যাত হতে পারেননি। নিজের শিল্পকর্ম সকলের কাছে পৌঁছে দিতে না পারার জন্য একটা অদ্ভুত দুঃখবোধ কাজ করত তাঁর মনে। এরকম একজন নিবেদিতপ্রাণ শিল্পীর জন্য তেমনভাবে কেউ এগিয়েও আসেনি। একদিন স্টুডিওতে বসে ওঁর মাথায় একটা আইডিয়া এল। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে নিজের শরীরে গাঢ় রঙ বুলিয়ে বিরাট ক্যানভাসের ওপর শুয়ে পড়লেন। তাঁর শরীরের ইম্প্রেশন পড়ল ক্যানভাসের ওপর। মুগ্ধ হয়ে সেটা দেখার পর তিনি এরপর বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ক্যানভাসের ওপর শুতে লাগলেন, বসতে লাগলেন। ক্যানভাসে একের পর এক ছবি ফুটে উঠতে লাগল ওঁর শরীরের। এই ছবিগুলো যখন এক্জিবিশনে এল তখন হইচই পড়ে গেল। মিস্টার ক্লাইন রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। বি.কে. দুদিকে হাতদুটো ছড়িয়ে দিয়ে কথা শেষ করলেন।

সোহিনী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানাল, কিন্তু শিল্প হিসাবে ওই ছবিগুলো কি বেঁচে আছে?

অবশ্যই নয়। কিন্তু ওঁর নামটা বেঁচে আছে। সাময়িকভাবে হলেও উনি ওঁর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। আসলে কি জানো, প্রত্যেকটা মানুষের জীবনেই কিছু যন্ত্রণা লুকিয়ে থাকে, যেটা একেবারে তার নিজস্ব। তুমি শিল্পী বলে তোমার যন্ত্রণার ক্ষেত্র একরকম, আবার যে মানুষটা একেবারে ছাপোষাভাবে পৃথিবীতে বেঁচে আছে, তার যন্ত্রণার ক্ষেত্র আর একরকম। তবে দুটোর মধ্যে একটা বেসিক তফাৎ রয়েছে—সেটা হল, তুমি তোমার যন্ত্রণাটাকে কাল্টিভেট করতে পারো, সে হয়তো পারে না। বি.কে. আত্মমগ্ন গলায় কথাগুলো বললেন।

বি.কে.-র গলায় এমন একটা সুর ছিল যেটা সোহিনী এবং আমাকে ছুঁয়ে গেল। আমি ইচ্ছে করেই ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলাম না, কিন্তু সোহিনী সেই ভুলটা করে ফেলল।

বি.কে.-র দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, এরকম কোনও যন্ত্রণা আপনিও চেপে রেখেছেন। সেটা কি শিল্পের জন্য, নাকি একেবারেই অন্য কিছু?

আমি ভেবেছিলাম বি.কে. বোধহয় এই প্রশ্নে একটু অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু উলটে দেখলাম বেশ উৎসাহ নিয়েই সোহিনীর দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে বললেন, বাঃ, তোমার অবজারভেশন পাওয়ার তো বেশ স্ট্রং! হ্যাঁ, যন্ত্রণা একটা আছে। তবে সেটা একেবারেই ব্যক্তিগত।

সোহিনী এবার আর কোনও প্রশ্ন করল না। তবে বি.কে. নিজেই বলতে লাগলেন, আজ থেকে বাইশ বছর আগে আমার সন্তানের পৃথিবীতে আসার কথা ছিল। অর্থাৎ এখন সে হত এক তরতাজা যুবক। কিন্তু সে সন্তান আসেনি। নির্দিষ্ট দিনের পাঁচদিন আগে লাবণ্য পা পিছলে পড়ে যান। অনেক চেষ্টায় ওঁকে বাঁচানো গেলেও শিশুটিকে বাঁচানো যায়নি। লাবণ্যকে নিয়েও যমে-মানুষে টানাটানি হয়েছিল। সেই শেষ। লাবণ্য তখন থেকেই একেবারে চুপ করে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন বাড়িতে বসে থাকার পর একটু একটু করে বেরোতে লাগল। এখন ও ওর মত রয়েছে, আমি আমার মত।

ব্যাপারটা সত্যিই স্যাড। তবে আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল যতটা আবেগ নিয়ে বি.কে. কথাগুলো বলছিল, তার পুরোটাই হৃদয় থেকে উঠে আসছিল না। সামান্য হলেও তাতে আরোপিত কিছু ব্যাপার ছিল। সোহিনী জিজ্ঞেস করল, উনিও কি ছবির ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড?

দুদিকে বেশ জোরে বারদুয়েক মাথা নেড়ে বললেন বি.কে., একেবারেই না। ওটা একান্তই আমার নিজের জগৎ। তবে লাবণ্যরও একটা নিজস্ব জগৎ আছে। ও অনেকগুলো সমাজসেবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। এরা গ্রামেগঞ্জে অনুন্নত মানুষদের জন্য কাজ করে। তাদের স্বনির্ভর করে তুলতে সাহায্য করে। লাবণ্য খুব সিরিয়াসলি এই কাজটা করে। এর জন্য ওকে প্রায়ই বাইরে, মানে ওই গ্রামে-গঞ্জে যেতে হয়, ও সেখানে যায়ও। তবে এসব নিয়ে ব্যস্ত থেকে ও ভালই আছে। প্রত্যেকটা মানুষেরই স্বাধীনতা আছে, তার নিজের মত করে নিজের জীবনটাকে চালনা করার।

সোহিনী এরপরে আর কোনও কথা বলল না। ইনফ্যাক্ট আমি বুঝতে পারছিলাম নিজের জন্য বলতে ওর খারাপ লাগছে। বি.কে. ওঁর কাজ নিয়ে আদৌ কিছু ভাবনাচিন্তা করছে কিনা, সেটাও বুঝতে পারছে না। সামহাউ বি.কে. সোহিনীর এই ভাবনাটা ধরতে পেরেছিলেন। এবার কথা ঘুরিয়ে বললেন, সোহিনী, আমি মোটামুটিভাবে একটা ছক ভেবে রেখেছি। প্রথমে ব্যাঙ্গালোর, তারপর বোম্বে, সবশেষে দিল্লিতে তোমার এক্‌জিবিশন করব...। শেষে বলতে, প্রথম ফেজের কথা বলছি। আর কলকাতাটাকে আমি ইচ্ছে করেই বাদ রাখলাম। দিল্লিটাই মোস্ট ইম্পরট্যান্ট। তুমি তৈরি হও। কাজকর্ম রেডি করো।

সোহিনী তো এসব শুনে হাঁ হয়ে গিয়েছিল। বি.কে. থামলে জিজ্ঞেস করল, আমি এত দূর ভাবতে পারছি না! আমার কাজ এতদূর যাবে এটা আমার স্বপ্নে ছিল, কিন্তু বাস্তবে সেটা ঘটবে এটা আমার কল্পনাতীত।

বি.কে. আবার কথার জাদু ছড়ালেন, স্বপ্ন দেখতে তো? ওইটাই আসল। একজন শিল্পীর যদি স্বপ্ন না থাকে তাহলে তার শিল্পীসত্তাটাই তো মরে যাবে। তবে হ্যাঁ, বাস্তবটা বড় কঠিন। স্বপ্নগুলোকে ঠিক ঠিক মত বাস্তবায়িত করাটা তাই সবসময় হয়ে ওঠে না। তুমি ধরে নাও আমি এই কাজটা করতেই সাহায্য করছি। তুমি ছবি আঁকো। ওটা তোমার

কাজ। আর মানুষের কাছে তাকে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আমার। ওটা আমার কাজ।

সোহিনী মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। ওর মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম, ও এত কিছু এক্সপেক্ট করেনি। হয়তো বা কিছুটা নার্ভাসও বোধ করছিল। একবার আমার দিকে তাকাল। তারপর বি.কে.-কে বলল, কিন্তু আমার ছবি যদি আপনার পছন্দ না হয়? আপনি তো আমার ছবিই দেখেননি! ছবি যদি ভাল না লাগে তাহলে এতদূর ভাবার তো কোনও মানেই হয় না।

বি.কে. হাসলেন, আমি মানুষ চিনি সোহিনী। তোমার মত একজন সুন্দর মেয়ের মনও নিশ্চয় সুন্দর হবে। আর তারই তো প্রতিফলন ঘটবে তোমার ছবিতে! তোমার ক্যানভাস তো তোমার মনের রঙেই রঙিন হয়ে উঠবে! আমি নিশ্চিত তোমার ছবি আমার ভাল লাগবেই। আমি খুব শিগ্‌গিরই তোমার বাড়িতে যাব।

সোহিনী কৃতজ্ঞতায় ভরে গিয়ে মাথা নাড়ল। তারপর উঠে দাঁড়াল, আজ তাহলে আসি আমি! খুব তাড়াতাড়িই আপনার ফোন এক্সপেক্ট করব! তারপর বাকিটা আমার ভাগ্য।

সোহিনীকে নিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম বি.কে.-র চেম্বার থেকে। কেন জানি না আমার মনটা ভাল লাগছিল না। সোহিনীর মুখ দেখে বুঝতে পারছিলাম ও স্বপ্নে মশগুল। বাইরে এসে ওকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিলাম। সোহিনী আমাকেও ওর বাড়ি যাবার জন্য বলল। বি.কে. দেখার আগে ও চাইছিল ওর ছবি কেউ একজন দেখুক। তাই আমার মত আনাড়ির ওপরও ও ভরসা করছিল। আমি ওকে আশ্বস্ত করেছিলাম নিশ্চয় যাব বলে। কেন জানি না সেদিনের পর থেকে সোহিনীর ভাবনাটা মাথা থেকে যাচ্ছিল না।'

দেবর্ষি প্রবালের ভাবনাটা ধরতে পারছিল। বলল, 'তুই সোহিনীকে সাবধান করিস নি কেন?'

প্রবাল মাথা নাড়ে। অধৈর্য গলায় বলে, 'সোহিনীকে আমি কি বলতাম বল তো? আমি নিজেও তো বুঝতে পারছিলাম না, আমার কেন এমন মনে হচ্ছিল। বলার মত কিছু তো ঘটেনি। পুরোটাই আমার মনে হওয়া। আমার শুধু মনে হত যা হচ্ছে বা যা হতে চলেছে, সবটা বোধহয় ঠিকঠাক হচ্ছে না বা হবে না!'

'কি হল তারপর?'

'তারপরের ঘটনাগুলো পর পর ঘটে গেল। বি.কে. সোহিনীর বাড়িতে গেলেন! খুব অনিবার্যভাবেই সোহিনীর ছবি ওঁর ভাল লাগল। এরপর খুব দ্রুতই সোহিনী বি.কে.-র যাদুতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমি এসবের ডিটেলস্ অত জানতাম না। কারণ সোহিনীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। আর সোহিনীরও বি.কে.-র সঙ্গে সম্পর্কটা সহজ হয়ে যাবার পরে আমাকে অত দরকার পড়ত না। অন্যদিকে বি.কে.-র কাছে এসব ব্যাপারে খোঁজখবর করাটা আমাকে মানায় না। তাছাড়া বি.কে. তো রোজ অফিসেও আসত না। যাইহোক, আমি যেটুকু খবর পেতাম পারমিতার মাধ্যমে। ও মাঝেমধ্যে আমাকে ফোন করত। একটা ব্যাপারে পারমিতার সঙ্গে আমার মিল হয়ে গেল। সোহিনীর ব্যাপারে আমি যে আশঙ্কায় ভুগতাম, সেটা যে কোনভাবে হোক ওরও মনে হয়েছিল। এর বেশিরভাগটাই সোহিনীর সঙ্গে কথা বলে। পারমিতাই

আমাকে বলেছিল সোহিনী আর বি.কে.-র ব্যাপারটা আর সহজভাবে নেওয়া যাচ্ছে না। সোহিনীর হাবভাব-আচরণ দেখে ও চিন্তিত হচ্ছিল। এইসময় এক নতুন পারমিতাকে দেখেছিলাম। সোহিনীর ব্যাপারে ও প্রথমে একটু ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়লেও, পরে ও জেনুইনলি সোহিনীকে বাঁচাতে উদ্যোগী হয়েছিল। এবং বিশ্বাস করবি কিনা জানি না, এইসময়টা থেকে পারমিতার সঙ্গে আমার অদ্ভুত সুন্দর একটা বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে গেল। পরস্পরকে হেল্প করাই শুধু নয়, পারমিতা ওর যাবতীয় প্রবলেম আমার সঙ্গেই ডিসকাস করত। আমার সাজেশান নিত। এটা অবশ্য এখনও আছে।'

প্রবালের কথা শুনে দেবর্ষি চোখ তুলে তাকাল ওর দিকে। প্রবাল হেসে মাথা নাড়ল, 'সত্যি রে, পারমিতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এখন অনেক সহজ। সেসব তিক্ততা দুজনেই ভুলে গেছি। যে কোনও কারণেই হোক পারমিতা অনেক র‍্যাশনাল হয়ে গেছে এখন। ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে এখন আর কোনও অসুবিধে হয় না আমার।'

দেবর্ষি জিজ্ঞাসা করল, 'সোহিনীর ব্যাপারটা কি হল?'

'হ্যাঁ, পারমিতাই একদিন আমাকে ফোনে জানাল, সোহিনীর সঙ্গে কথা বলে ও খুব চিন্তিত হয়ে রয়েছে, কারণ বি.কে. সম্পর্কে সোহিনী বোধহয় একটু বেশিই দুর্বল হয়ে পড়েছে। প্রথমে নাকি ও বলত খুব ছোটবেলায় বাবাকে হারানোর ফলে, বাবার একটা অভাববোধ ওর জীবনে থেকে গেছে, সেটাই নাকি ও বি.কে.-র মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে। একইরকম স্নেহ, আশ্রয়দাতার মত ব্যবহার এইসব। সবরকমভাবে বি.কে.-র ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছে ও। কিন্তু সেই স্নেহের আড়ালে বি.কে.-র ব্যবহার ক্রমে বদলাতে শুরু করেছে। সোহিনীও যে সেটা প্রশ্রয় দিচ্ছে, পারমিতা ওর কথাবার্তা থেকেই বুঝতে পেরেছে। সব থেকে সর্বনাশের দিক যেটা ও মনে করছে, এসবের বাইরে সোহিনীর বিখ্যাত হবার নেশা। একেবারে ছাপোষা মধ্যবিত্ত জীবনের বাইরে যে রঙিন দুনিয়াটা অপেক্ষা করছে, সোহিনীর চোখ এখন সেদিকে। আর্টিস্ট হিসেবে বিখ্যাত হবার পাশাপাশি প্রচুর অর্থ রোজগারের হাতছানির মূর্ছনায় ও এখন বিভোর। আর এ-সবের নেশাই ওকে ধরিয়েছে বি.কে.। সোহিনী বি.কে.-র পরামর্শ ছাড়া এক-পাও চলছে না। এমনকি ওর মা-ও যে এসব পছন্দ করছেন না, পারমিতা সেকথাও জানাল আমাকে। ভদ্রমহিলা নাকি ওঁর বাড়িতে বি.কে.-র এই ঘনঘন যাতায়াত একেবারেই ভাল চোখে দেখছেন না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় দুজনে কাটাচ্ছে সোহিনীর স্টুডিওতে। ওদের বাড়িরই সম্পূর্ণ আলাদা একটা দিকে সোহিনীর স্টুডিও। পারমিতা আমাকে বলল ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবতে। কারণ ওর ধারণা সোহিনীর নরম ছেলেমানুষী স্বভাবের সুযোগ নিচ্ছে বি.কে. এবং হয়তো অদূর ভবিষ্যতে সোহিনী আরও বড় কোনও ট্র্যাপের মধ্যে পড়ে যাবে। পারমিতার ফোনের পরে আমি আরও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। এরমধ্যে সোহিনীর সঙ্গে দু-চারবার দেখা বা কথাবার্তা হয়েছে। কিন্তু এমন কোনও ঘনিষ্ঠতা হয়নি, যে ওর ব্যক্তিগত ব্যাপারে আগ-বাড়িয়ে কথা বলতে পারি। সাত-পাঁচ ভেবে একদিন ওর বাড়িতেই যাব ঠিক করলাম। কিন্তু তার আগেই একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে সোহিনী এসে হাজির আমার ফ্ল্যাটে!'

দেবর্ষি অবাক চোখে তাকায়, 'কীরকম?'

'একদিন আমি অফিস বেরোবার জন্য পুরো তৈরি, এইসময় দরজায় বেল। একটু

বিরক্ত হয়েই দরজা খুলে দেখি সোহিনী দাঁড়িয়ে। আমি তো অবাক। তাড়াতাড়ি আসতে বললাম ভেতরে। পারমিতার কাছ থেকে ও নাকি আমার ফ্ল্যাটের অ্যাড্রেস নিয়েছে। আমি দেখলাম মুখটা একটু শুকনো শুকনো, যেন কোনও বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তিত। ওকে বসতে বলে আমি অফিসে একটা ফোন করে দিলাম। সেদিন ওর সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছিল। নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের কথা। আমি কেন ফ্ল্যাটে একা থাকি, বিয়ে করছি না কেন, এসব কথা। পারমিতা আমার সম্পর্কে অনেক কথাই ওকে এর মধ্যে বলে ফেলেছে—আমার রাজনীতি করার কথা, মন্দিরার কথা, ইংল্যান্ড যাওয়ার কথা, এমনকি বাবার সঙ্গে আমার মতবিরোধের কথাও। সোহিনী নিজের জীবনের গল্পও বলল। ওর বাবার সঙ্গে ওর দারুণ একটা অ্যাটাচমেন্ট ছিল। বাবাই ছিলেন ওর আঁকার প্রেরণা। ওঁর উৎসাহেই সোহিনীর ছবি আঁকা। কিন্তু মাত্র পনেরো বছর বয়স যখন ওর প্লেন ক্র্যাশে মারা যান উনি। সোহিনী তারপর ছবি আঁকাই ছেড়ে দিয়েছিল। অনেক পরে ওর মা আবার ধীরে ধীরে ওকে ছবির জগতে ফিরিয়ে এনেছিলেন। এখন ছবি আঁকাই ওর সব। এইসময় আমি ওকে প্রশ্ন করলাম, সোহিনী, আপনি কি শুধুই ভালবেসে ছবি এঁকে যান? মানে এর বাইরে সত্যিই কি আপনার আর অন্য কোনও চাহিদা নেই?

সোহিনী একটু থমকাল, আপনার প্রশ্নটা আরও একটু ক্লিয়ার করুন।

আমি তখন সরাসরিই বললাম, সোহিনী, ছবি আঁকার আনন্দের বাইরেও আপনি কি চান না, শিল্পী হিসেবে বেঁচে থাকতে, বিখ্যাত হতে? এবং সেই খ্যাতির পাশাপাশি অর্থ-উপার্জন করতে? যে অর্থ আপনাকে সুখ দেবে স্বাচ্ছন্দ্য দেবে? ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মনের ভেতর এই ব্যাপারগুলো কি একেবারেই কাজ করে না বলতে চান?

সোহিনী একটু চুপ করে থাকল। তারপর বলল, এসব প্রশ্নের উত্তর এত সহজে দেওয়া যায় না প্রবালবাবু। তবে যদি আমি বলি, এসব ব্যাপার নিয়ে আমি একেবারেই ভাবি না, তাহলে মিথ্যে বলা হবে। আবার এসবের জন্যেই ছবি আঁকি এটাও ঠিক কথা নয়।

কেন নয়? আমি প্রশ্ন করলাম।

সোহিনী তখন একটু উদাস স্বরে বলল, শিল্পীদের জীবন বড় কষ্টের প্রবালবাবু। সৃষ্টির একটা যন্ত্রণা থাকে এবং সে যন্ত্রণাটা কারও সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায় না। এটা একেবারেই নিজের জন্য। তবে শিল্পীরাও তো মানুষ। তাদের ভাবনাচিন্তা, অনুভূতির ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত হলেও আর সব চাওয়া-পাওয়াগুলো তো বাকি পাঁচটা সাধারণ মানুষেরই মত। আর মানুষ হিসেবে সকলেই তো চায় ভালভাবে বাঁচতে। সেটা কি দোষের? নিশ্চয়ই নয়। তবে এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি এখন একটু ধন্দে আছি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, কেন? এরকম মনে হওয়ার কারণ?

সোহিনী তখনও বোধহয় একটু দোদুল্যমানতায় ভুগছিল। আমি ওকে সহজ করবার জন্য বললাম, আপনি নিশ্চিন্তে সবকিছু বলতে পারেন। আমি আপনাকে বন্ধু বলেই মনে করি। আর সেই দাবিতেই বলতে পারি বন্ধুর কাছে কিছু লুকিয়ে রাখতে নেই।

সোহিনী একথায় আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর হেসে বলল, ধন্যবাদ। আপনার বন্ধুত্ব আমার দরকার ছিল। কিন্তু নিজের মুখে বলতে কেমন অসুবিধে লাগছিল।

কারণ আমার মনে হয়েছে, পারমিতা আপনাকে খুবই পছন্দ করে, এবং আপনার ব্যাপারে ও একটা কর্তৃত্ব বা অধিকার দেখাতে পছন্দ করে। আমি সেই কারণেই একটু হেজিটেট করছিলাম। তবে আপনি নিজে থেকেই আমাকে আশ্বস্ত করাতে আমার মনের চাপটা কমে গেল।

আমি একটু হেসে বললাম, পারমিতা আমার খুব ভাল বন্ধু। তবে অনেকদিনের পুরোনো বন্ধু তো, তাই বোধহয় আপনার ওরকম মনে হয়েছে। আর ভাল বন্ধু হলে তার ওপর একটা অধিকারবোধ আপনা থেকেই তৈরি হয়ে যায়। এ নিয়ে আপনার চিন্তার কিছু নেই। আর আমার যতদূর মনে হয়েছে, পারমিতা আপনাকেও খুব ভালবাসে, আপনার জন্যেও ভাবে। আপনি নিশ্চিন্তে আমাকে সবকিছু বলতে পারেন।

সোহিনী এবার অস্বস্তি কাটিয়ে সরাসরি বি.কে.-র প্রসঙ্গে এল। বলল, দেখুন. আপনার বস্ মিস্টার বিপিন কুণ্ডুর সঙ্গে পরিচয়টা আমার হয়েছে আপনারই মাধ্যমে তাই আপনার সঙ্গেই এ ব্যাপার নিয়ে কথা বলা শ্রেয় মনে করলাম। ভদ্রলোককে আমার বেশ ভালই লাগে। ইনফ্যাক্ট ছবির ব্যাপারে ওঁর ইনভলভমেন্টটা আমাকে বেশি টানে তাছাড়া ওঁর কনসেপশনটাও খুব ক্লিয়ার। বলতে পারেন এত অল্প সময়ের মধ্যেই আমি ওঁর ওপর অনেকটা নির্ভর করতে শুরু করেছি। আসলে আমরা মেয়েরা যতই স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করি না কেন, ভেতরে ভেতরে আমরা আসলে ভীষণভাবে পরনির্ভরশীল। কারও সাহচর্য মনের মত হলে আমরা অজান্তেই তার ওপর নির্ভর করতে শুরু করি। হয়তো বিধাতা আমাদের মনের গঠনটাই এমনভাবে তৈরি করেছেন। একই ঘটনা ঘটেছে বিপিন কুণ্ডুর ক্ষেত্রেও। ভদ্রলোক আমার থেকে বয়সে অনেক বড়। প্রায় আমার বাবার বয়সী। যদিও দেখে বা হাবভাবে তা মনে হয় না। কিন্তু উনি আমার ব্যাপারে, আমার কাজের ব্যাপারে এত উৎসাহ দেখান, আমাকে এত বেশি ভাবে সাহায্য করেন যে আমি ধীরে ধীরে ওঁর ওপর নির্ভর করতে শুরু করি। প্রায় প্রত্যেকদিনই অনেকখানি করে সময় কাটানোর জন্যে আমরা এখন পরস্পরেব ব্যক্তিগত জীবনযাপন, পাওয়া-না-পাওয়া নিয়েও কথা বলি। উনি ওঁর স্ত্রীর কথা আমাকে বলেছেন। আমি প্রথমদিকে অস্বস্তিবোধ করতাম, বারণও করেছি একাধিকবার—এসব পারসোনাল ব্যাপার নিয়ে কথা না বলতে, কিন্তু উনি শোনেননি। ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে যে ওঁর সম্পর্ক ভাল নয়—দুজনে যে যার মত থাকেন—এমনকি ছবির ব্যাপারে ওঁর এত উৎসাহকেও যে ওঁব স্ত্রী ভাল চোখে দেখেন না এসবই আমাকে বলেছেন উনি।

শেষের কথাটা আমার কানে লাগল। সোহিনীকে জিজ্ঞেস করলাম, ওঁর স্ত্রী কি বলেন এই ছবির ব্যাপারে?

সোহিনী মুখ নিচু করে একটু বসে থাকল। তারপর বলল, সেটা শুনে আমার খুব একটা ভাল লাগেনি, জানেন! ওঁর স্ত্রী লাবণ্য নাকি বলেন. ছবিব ব্যাপারে ওঁর এই উৎসাহের পুরোটাই নাকি সাজানো। নতুন শিল্পীদের নিয়ে উনি ব্যবসা করেন। তাদেব মধ্যে লোভের জন্ম দেন। টাকা-প্রতিপত্তি বিখ্যাত হওয়াব লোভ। এর দ্বাবা সত্যিকারেব শিল্পীদেব উনি ক্ষতিই করেন। তাদের শিল্পীসত্তাকে খুন করেন। এটা ছাড়াও ওঁর মিসেসের বক্তব্য, যে দেশে হাজার হাজার লোক অনাহারে অশিক্ষায় দিন কাটায় সেখানে তাদের উন্নতির চিন্তা ছেড়ে এসব শিল্পের পেছনে টাকা নষ্ট করাটা পুরোটাই

বিলাসিতা। এসব করে মতলববাজরা। ভাবুন একবার!

সোহিনী তাকাল আমার দিকে। আমি ওর দিকেই তাকিয়ে ছিলাম এতক্ষণ। বেশ জোর দিয়ে কথাগুলো বলছিল সোহিনী। কিন্তু আমি কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করেই ছিলাম। আসলে মনে মনে আমি কথাগুলো বিশ্লেষণ করছিলাম। সোহিনী আমার কাছ থেকে কোনরকম প্রতিক্রিয়া না পেয়ে নিজেই বলল, আমি জানি, আপনি হয়তো মিসেস কুণ্ডুর কথাগুলোর সঙ্গে একমত, আই মীন, আর্ট সম্পর্কে ওঁর বক্তব্যের সঙ্গে, কারণ আপনি বামপন্থী রাজনীতি করতেন, গরীব মানুষের জন্য লড়াই করতেন। তাদের স্বপক্ষে কথা হলে আপনি সেটাই সমর্থন করবেন। কিন্তু আপনি বলুন, এসব তো আছেই, যুগে যুগেই আছে—একশ্রেণীর মানুষ সুখে থাকে, অন্যশ্রেণীর মানুষ লড়াই করে, ঘাম ঝরায়, তারা তথাকথিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের থেকে অনেক দূরে থাকে। কিন্তু এর জন্য শিল্প হারিয়ে যাবে? অদ্ভুত যুক্তি না? পৃথিবীতে ক্ষুধা আছে বলে কবিতা থাকবে না, দারিদ্র্য আছে বলে গান থাকবে না, অশিক্ষা আছে বলে সাহিত্য থাকবে না?

সোহিনী উত্তরের আশায় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। ওকে দেখে আমার মায়া লাগছিল। কিন্তু আমি এসব তর্কের মধ্যে না গিয়ে বি.কে. সম্পর্কে আরও তথ্য জানার চেষ্টা করলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কি মনে হয়, বি.কে.-র সঙ্গে ওঁর স্ত্রীর এই একটা ব্যাপারেই কনফ্লিক্ট? শুধু ছবির ব্যাপারে?

সোহিনী সঙ্গে সঙ্গে বলল, ঠিক একই প্রশ্ন আমিও করেছিলাম প্রবালবাবু। কেন জানি না, আমিও একটু কিউরিয়াস হয়ে পড়েছিলাম। উনি উত্তরে বলেছিলেন, সম্পর্কই নেই তো সংঘাত আসবে কোত্থেকে? যে যার কাজে মশগুল থাকি। আমি ছ-মাস একা লন্ডনে থাকি, উনি তখন যান না। আবার আমি যখন এখানে আসি, তখন উনি হয়তো ওঁর এন.জি.ও.-র কাজে চলে যান পুরুলিয়া, বাঁকুড়া বা ছোটনাগপুরের কোনও ক্যাম্পে। কোনও সম্পর্কই আমাদের মধ্যে নেই। উই আর জাস্ট অফিসিয়াল হাজব্যান্ড-ওয়াইফ।

সোহিনীর কথা শুনতে শুনতে আমি আরও অনেকটা ক্লিয়ার হচ্ছিলাম। আমি ওকে বললাম, আপনি কি ভাবছেন?

সোহিনীর মুখে আগের সেই অস্বস্তিকর চিহ্ন ফুটে উঠল। ও বলল, আমি ঠিক নিজেই জানি না। কিন্তু এটুকু জানি, এসব ব্যাপারে আমি ইন্টারেস্টেড ছিলাম না। এত বেশি বয়সের একজন মানুষ যখন তাঁদের কনজুগাল লাইফ নিয়ে কথা বলেন, আমার শুনতে খুবই অস্বস্তি হয়। সেই কথা বলিও ওঁকে, কিন্তু উনি বলেন আমার নাকি বোঝার বা অনুভব করার মত একটা মন আছে, সেটার কারণেই উনি আমাকে বলতে চান। আমি বুঝতে পারি উনি আমার কাছে মানসিক আশ্রয় চান। আমাকে প্রায়ই প্রশ্ন করেন, ওঁর সম্পর্কে আমি কি ভাবি জানতে চান। আসলে আমি ছবি ভালবাসি। তাই এই জগতের সঙ্গে যুক্ত সকলকেই আমি নিজের মত করেই মনে করি। ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক ওঁর ব্যক্তিগত জীবন, অভাব অনুভূতির সঙ্গেও আমি জড়িয়ে গেছি। একই ব্যাপার আমার ক্ষেত্রেও। ছবির জগৎ ছাড়া আমার অন্য কোনও জগৎ আছে কিনা—সেখানে আমার বিশেষ কোনও ইনভলভমেন্ট আছে কিনা এসবও উনি জানতে চেয়েছিলেন। আমি প্রথমে এড়িয়ে গেলেও পরে উনি সরাসরিই বলেছিলেন যেহেতু উনি আমার ব্যাপারে

উদ্যোগী, তাই আমার ব্যক্তিগত জীবনের সম্পর্কে একটা ধারণাও ওঁর থাকা দরকার। এর পরে আমি আর আপত্তি করিনি। আমার যে সেরকম বিশেষ কেউ নেই, সেটাও বলে দিই। ছবির সঙ্গেই আমার সখ্যতা, ছবির সঙ্গেই আমার বসবাস। উনি খুশি হয়েছিলেন খুব আমার উত্তর শুনে। মুশকিল হচ্ছে বাড়িতে আমার মা ওঁর সঙ্গে আমার এত বেশি সময় কাটানোকে ভাল চোখে দেখছেন না। এখনও সরাসরি আমাকে কিছু বলেননি কিন্তু আমি বুঝতে পারি। আসলে মানসিকভাবে কোনও এক জায়গায় আমার সঙ্গে ওঁর ভীষণ মেলে। আমি ওঁর একাকীত্বকে ফিল করি। কিন্তু মাঝেমাঝে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করি, ওঁকে বিশ্বাস করে ঠিক করছি কিনা। আর্টিস্ট হিসাবে আমার ভবিষ্যৎ এখন ওঁর হাতে বাঁধা। এর মধ্যে পারমিতাও একদিন এসে আমাকে ঠারেঠোরে সাবধানে এগোতে বলেছে। এমনকি বি.কে.-র সঙ্গে সম্পর্কটা নিয়েও ভাবতে বলেছে। সব মিলিয়ে আমি ভীষণ কনফিউজড।

আমি সোহিনীর অবস্থা বুঝতে পারছিলাম। একদিকে রঙিন জীবনের হাতছানি—অন্যদিকে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ—এই দুইয়ের মধ্যিখানে ও বিভ্রান্ত। দারুণ একটা টানাপোড়েন চলছে ওর মনের ভিতর। আমি দেখলাম এর চটজলদি কোনও সমাধান নেই। ধীরে ধীরে এগোতে হবে! তবে অবাক হচ্ছিলাম বি.কে.-র ক্ষমতা দেখে। একটা বছর পঞ্চান্নর লোক, বাইশ-তেইশের একটা মেয়েকে এভাবে বাঁধতে পারে? রিয়েলি লোকটা জিনিয়াস! আমি সোহিনীকে বললাম, দেখুন কে কি বলছে তার থেকেও অনেক বেশি ইমপর্ট্যান্ট আপনি ব্যাপারটাকে কীভাবে ভাবছেন! কোন্‌টা বেশি জরুরি আপনার কাছে! জীবনে সাফল্য সবাই চায়—এ ব্যাপারে কেউ না কেউ কোনও না কোনও সময়ে আপনাকে সাহায্য করবে, এটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এসবের মধ্যে থেকেও নিজেরটা বুঝে নেবার দায়িত্ব একান্তভাবেই আপনার নিজের।

সোহিনী মাথা নাড়ল, আমি জানি। তবে রিসেন্ট যেটা হয়েছে—পরশুদিন বি.কে. আমার বাড়িতে এসেছিলেন। আমি একটা ছবি শেষ করছিলাম। উনি আমাকে না বলে একের পর এক আমার আঁকা ছবিগুলো বের করছিলেন, একেকটা অনেকক্ষণ ধরে দেখছিলেন, কিছু কিছু বেছে আলাদা করে রাখছিলেন। আমি প্রথমে অত গুরুত্ব দিইনি। ভেবেছি এমনিই ছবিগুলো দেখছেন উনি। কিন্তু তারপর যেটা বললেন উনি, তাতে আমি চমকে গেলাম। ব্যাঙ্গালোরে এক্‌জিবিশনের ডেট উনি ফিক্সড করে ফেলেছেন। সেইমত বুকিং থেকে শুরু করে অফিসিয়াল অন্যান্য কাজকর্মও এগিয়ে ফেলেছেন। এখন আমার কাজ ছবিগুলো অ্যারেঞ্জ করা। মোটামুটি চল্লিশটা ছবি ওখানে লাগবে। উনি যেগুলো পছন্দ করেছেন, সেগুলো সব মিলিয়ে কুড়িটা হয়েছে। বাকি কুড়িটা ছবি, এর মধ্যে আমাকে কমপ্লিট করতে হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কতদিনের মধ্যে?

'মোটামুটি একমাস। ডেটও ঠিক হয়ে গেছে বলে উনি এর মধ্যে কার্ড ছাপাতেও দিয়ে দিয়েছেন। প্রথমে তো আমি বুঝতে পারছিলাম না, এত অল্প সময়ে এতগুলো ছবি আমি আঁকতে পারব কিনা। উনি তখন আমার কিছু ইনকমপ্লিট ছবি বেছে দিয়ে সেগুলো কমপ্লিট করতে বললেন। বাকি কিছু নতুন ছবি আঁকতে বললেন। আমি বাড়িতে এখনও কিছু বলিনি। মানে, কি করব ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার একার প্রথম এক্‌জিবিশন

হতে যাচ্ছে, কোথায় আমার আনন্দ হবে—তা না, আমার সাংঘাতিক টেনশন হচ্ছে। এরকম সুযোগ তো বারবার আসে না। কলকাতার বাইরেও আমার নাম ছড়িয়ে পড়বে—এটা আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।

সোহিনীর মুখে একটা অদ্ভুত আলো দেখছিলাম আমি। ইচ্ছে করেই বললাম, খুব খুশি হলাম শুনে। এরকমই তো হওয়ার কথা। বেস্ট অফ লাক!

সোহিনী গভীরভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর নরম গলায় বলল, সবই তো হয়েছে আপনার জন্য। আপনার কাছে আমি সারাজীবন ঋণী হয়ে থাকব।

আমি সঙ্গে সঙ্গেই বললাম, একেবারেই ওসব কথা তুলবেন না। জানেন তো, রামচন্দ্র যখন লঙ্কায় যাবার জন্যে সমুদ্রে সেতু বাঁধছিলেন, একটা কাঠবেড়ালিও নাকি তাঁকে সাহায্য করেছিল। এক্ষেত্রে সেই কাঠবেড়ালির ভূমিকাটুকু নিতে পেরে আমিই নিজেকে ধন্য মনে করছি!

সোহিনী আমার কথা শুনে হেসে ফেলল। পরক্ষণেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'আপনার অনেক দেরি করিয়ে দিলাম আমি জানি, কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমি একটু খামখেয়ালি। অনেকটাই নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপর চলি। তখন খেয়াল থাকে না, অন্যের অসুবিধে করলাম কিনা। তবে এটা স্বীকার করছি, আপনার সঙ্গে কথা বলে নিজেকে অনেকটা হালকা লাগছে। হয়তো অনেক অবান্তর কথা বললাম—কিন্তু আপনাকে আমাব ভাল লেগেছে। আপনি এত ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনলেন, আমি আরও একবার কৃতজ্ঞ হয়ে গেলাম আপনার কাছে। দরজার দিকে এগোতে এগোতে সোহিনী বলছিল কথাগুলো।

আমি প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম, আমিই নিজেকে ধন্য মনে করছি কারণ এতজনের মধ্যে থেকে আপনি আমাকেই বেছে নিয়েছেন আপনার ভাবনার শরিক হবার জন্য। আই অ্যাম রিয়েলি অনারড্।

সোহিনী কথাটা শুনে হাসল। পরক্ষণেই ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে আমার চোখে চোখ রেখে বলল, আপনি কি কাঠবেড়ালি থেকে আপনার ভূমিকাটা আর বাড়াতে পারেন না প্রবালবাবু? নাকি বাড়াতে চান না?

সোহিনী আর দাঁড়ায়নি। আমাকে উত্তর দেবার সুযোগও দেয়নি। কিন্তু আমি কিছুক্ষণের জন্য স্পেল-বাউন্ড হয়ে গিয়েছিলাম। কি বলতে চেয়েছিল সোহিনী আজও ভাবি। কারণ ও তো তখন পুরোপুরি বি.কে.-তে মশগুল।'

দেবর্ষি আধশোয়া হয়ে প্রবালের কথা শুনছিল। এবার বলল, 'তুই ওকে আরও একটু গার্ড করলে পারতিস। আমার ধারণা ও সেইজন্যই তোর কাছে এসেছিল। হয়তো মুখ-ফুটে সে কথা বলতে পারেনি। আসলে আমার যা মনে হচ্ছে ও বোধহয় একটু বেশিই চাপা স্বভাবের ছিল। নিজের মায়ের সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচনা করতে পারেনি। পারমিতাও যে ঠিকমত ওকে কেয়ার করতে পারবে না, সেটা ও বুঝেছিল, কারণ পারমিতা একেবারে অন্যধরনের মেয়ে, অতটা অনুভূতিপ্রবণ নয়, তাই তোর মতামতটা জানতে এসেছিল। কিন্তু অতটা খোলাখুলি বলতে পারেনি।'

প্রবাল দেবর্ষির কথা শুনে চুপ করে থাকে। কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন থেকে আকাশের

দিকে তাকিয়ে ফিরে আসে কথায়, 'আসলে এতদিনে একটা জিনিস বুঝেছি, কেউ কারও ভাগ্য পালটে দিতে পারে না। যে যার নিজের ভাগ্য গড়ে নেয়। সেটাই ভবিতব্য। এর পরের ঘটনাগুলো শুনলেই বুঝতে পারবি আমি ওকে যদি আরও বেশি কিছু বোঝাতাম তাহলে ও আমাকেও ভুল বুঝত কিংবা আমার সঙ্গেও ওর সম্পর্ক খারাপ হয়ে যেত যেমনটা হয়েছিল পারমিতা এমনকি ওর মায়ের সঙ্গেও।'

'কেন? আমার তো মনে হচ্ছে বি.কে. সম্পর্কে ওর মনেও একটা কনফিউশন তৈরি হয়েছিল। তাহলে?' দেবর্ষি জানতে চাইল।

'হলেও বা। বি.কে.-কে তুই চিনিস না। তুখোড় বিজনেসম্যান। সোহিনীর মত একটা বাচ্চা মেয়েকে হ্যান্ডেল করা ওর কাছে জলভাত। তাছাড়া পরে জেনেছি এটা ওর প্র্যাকটিসের মধ্যে ছিল। পারমিতাকে আমি সবই বলেছিলাম। ব্যাঙ্গালোর যাবার প্ল্যান শুনে পারমিতা আর স্থির থাকতে পারেনি। সোহিনীর মাকে গিয়ে খোলাখুলি সব বল ছাড়াও ও গিয়েছিল মিসেস কুণ্ডুর কাছে।'

'বলিস কি!' দেবর্ষি অবাক গলায় বলল।

'হ্যাঁ, লাকিলি মিসেস কুণ্ডু তখন কলকাতায় ছিলেন। ও ফোনে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছিল। প্রথমে এরকম অপরিচিত একজনের সঙ্গে দেখা করতে একটু গাঁইগুঁই করলেও শেষ অবধি রাজি হয়েছিলেন উনি। পারমিতা সব বলেছিল ওঁকে এভরিথিং। আমি শুনেছি, থমথমে মুখে সব কথা শুনেছিলেন ভদ্রমহিলা। প্রথমে স্বামীর হয়ে বললেও, পরে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন পারমিতার অনুরোধের কাছে। সোহিনীকে বাঁচানোর জন্য একজন মেয়ে হিসেবে ওঁর হেল্প চেয়েছিল পারমিতা। স্বামীর স্বভাবচরিত্র কিছুই অজানা ছিল না ওঁর। তাই বোধহয় একটু একটু করে নরম হয়েছিলেন। সোহিনীর ফোননম্বর অ্যাড্রেস নিয়ে নিজেই যোগাযোগ করেছিলেন সোহিনীর সঙ্গে। এসব আমি পরে শুনেছি, সোহিনী মারা যাবার পর। মিসেস কুণ্ডুকে যখন খবরটা জানাতে গিয়েছিলাম তখন আমার সামনে উনি কেঁদে ফেলেছিলেন। তখনই বলেছিলেন সোহিনীকে নিজের মেয়ের মত করে সাবধান করেছিলেন। কিন্তু সোহিনী তখন বোধহয় সবকিছুর উর্ধ্বে চলে গিয়েছিল। মিসেস কুণ্ডুকেও সন্দেহের চোখে দেখে, ওঁকে ঈর্ষাকাতর বলে অপমান পর্যন্ত করেছিল। ওর ধারণা হয়ে গিয়েছিল ওর উন্নতিতে পারমিতা থেকে শুরু করে মিসেস কুণ্ডু সবাই জেলাস হয়ে পড়েছিল, তাই নানাভাবে বাধা দিতে চাইছিল। মিসেস কুণ্ডু তখন আস্তে আস্তে সব খুলে বলেছিলেন। বেছে বেছে এরকম বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদেরকেই সাহায্য করতে যান বি.কে.। এর আগে একটি অবাঙালী মেয়েকে উনি ট্র্যাপে ফেলেছিলেন। অনেক কাণ্ডের পর সে নাকি পালিয়ে বেঁচেছিল। শেষ ঘটনাটা ঘটেছে বছরখানেক আগে। ওই মেয়েটিও সদ্য আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছিল চোখে অনেক স্বপ্ন নিয়ে। বি.কে. একইরকমভাবে ধীরে ধীরে জাল বিছিয়ে মেয়েটিকে আয়ত্তে এনেছিল। ওকে নিয়েও ব্যাঙ্গালোরে এক্জিবিশন করতে গিয়েছিল। মেয়েটি আর ফেরেনি! সেই থেকে নিখোঁজ!'

'বলিস কি রে? এ তো একেবারে ক্রিমিনাল!' দেবর্ষি চেঁচিয়ে ওঠে।

'হুঁ', প্রবাল মাথা নেড়ে বলে, 'কিন্তু এসব ক্রিমিনালদের একটা চক্র থাকে জানিস তো। সে চক্রের হাতের পুতুল হয়ে থাকে আমাদের পুলিশ, আইন-কানুন, আদালত

সবকিছু। মেয়েটির বাবা-মা নাকি পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। তারা এখনও খুঁজে চলে মেয়েটিকে। বি.কে.-র বাড়িতে ফোন করে। বেশ কয়েকবার সেই ফোন মিসেস কুণ্ডুও ধরেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু করা যায়নি। বি.কে. ঘাটঘোট বেঁধেই কাজকর্ম করে। মিসেস কুণ্ডু মেয়েটির ফোন নম্বর পর্যন্ত সোহিনীকে দিয়েছিলেন। কিন্তু তোকে তো বলেছি, সোহিনী মৃত্যুর পথে পা বাড়িয়েই ছিল। এসবের পুরোটাই সাজানো বলে উড়িয়ে দিয়েছিল ও।' প্রবাল কাঁধ ঝাঁকায়।

দেবর্ষির কপালে ভাঁজ, 'তারপর?'

'তারপর আর কি! দিন-রাত জেগে সোহিনী তখন ছবি আঁকছিল। ব্যাঙ্গালোর ওকে যেতেই হবে! এইসময় কেউ গেলে ও খুব বিরক্ত হত। কারণ ও মনে করত সকলেই বোধহয় ওর খারাপ চায়। এমনকি একদিন আমিও গিয়েছিলাম। ও কাজ করতে করতেই দু-একটা কথা বলেছিল। তখনই মাসিমার কাছ থেকে শুনেছিলাম, পারমিতার সঙ্গে ওর সাংঘাতিক ঝগড়া হয়ে গেছে। যা নয় তাই বলে ও পারমিতাকে অপমান করেছে। আমার সঙ্গে জড়িয়ে আজেবাজে কথা বলেছে। পারমিতা সেই থেকে ওর বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। মায়ের সঙ্গেও বিশেষ কথা নেই। কারণ ওর ব্যাঙ্গালোর যাওয়াটা মাসিমা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। সোহিনীকে দেখে বুঝেছিলাম, ও চূড়ান্ত অ্যাডামেন্ট হয়ে গিয়েছে। ওকে ফেরানোর ক্ষমতা কারও নেই। বি.কে. তখন ওর কাছে স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। মাসিমার কাছে শুনলাম, ইন্ডিয়ায় এক্‌জিবিশনগুলো হয়ে গেলে বি.কে. সোহিনীকে প্যারিসে নিয়ে যাবে বলেছে। সত্যি বলতে কি, আর ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাইনি আমি। কাজের চাপও ছিল। আমার তো নিজের কাজের বাইরেও হাজার রকম উটকো ঝামেলা। ইউনিয়নের লোকেরা তো একটা পা বাড়িয়েই বসে থাকে। তাদের বায়নাক্কা মেটানো, ম্যানেজমেন্টের মন রাখা—একেবারে তুখোড় ব্যালেন্সের খেলা। পারমিতার সঙ্গেও আর যোগাযোগ হয়নি। আমার মনে হয়েছিল পুরো ব্যাপারটায় পারমিতাও যথেষ্ট আপসেট। যাইহোক, বি.কে. অফিসিয়াল কাজে বাইরে যাচ্ছেন বলে তো চলে গেলেন কলকাতার বাইরে। আমি তো জানতাম অফিসিয়াল কাজটা কি। সোহিনীর মায়ের কাছে শুনেছিলাম, সোহিনী নাকি বলেছে আটদিনের জন্য ও ব্যাঙ্গালোরে যাবে। কিন্তু বি.কে. অফিসে বলে গেছে পনেরো দিন ও আউট-অফ-ক্যালকাটা থাকবে। একটু খটকা লাগলেও আমি আর মাথা ঘামাইনি। কারণ এমনিতেই বি.কে. না থাকলে সবাই সাপের পাঁচ পা দেখে। বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। আমার আর অত খেয়াল ছিল না। একদিন অফিসে ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম, এইসময় মাসিমা মানে সোহিনীর মায়ের ফোন এল। ভীষণ ভেঙে পড়া গলা। হাউমাউ করে অনেক কথা বললেন। তার থেকে যা বুঝলাম সোহিনীর ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরে আসার কথা ছিল দুদিন আগে, কিন্তু এখনও ফেরেনি। কোনও ফোন বা যোগাযোগও করেনি। ও যে ফোননম্বর দিয়ে গিয়েছিল, সেখানে কেউ ফোন ধরছে না। উনি আমার কাছে জানতে চাইলেন বি.কে. ফিরেছেন কিনা। আমি বললাম উনিও ফেরেননি। ফোনেই কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন উনি। কোনমতে থামালাম ওঁকে। খোঁজখবর নিয়ে জানাচ্ছি বলাতে একটু শান্ত হলেন। আমি বি.কে.-র বাড়িতে ফোন করলাম। মিসেস কুণ্ডু ফোন ধরলেন। পুরো ব্যাপারটা বললাম। কিন্তু উনিও বললেন কোনও খবর পাননি। বি.কে.ও বাড়িতে

কোনও যোগাযোগ করেননি। মহাবিপদে পড়লাম। খুব স্বাভাবিক ভাবে খারাপ চিন্তাটাই আগে হয়। তবে মিসেস কুণ্ডুর একটা কথায় একটু আশ্বস্ত হলাম। বি.কে. নাকি এর আগেও এরকম করেছেন। যেদিন ফেরার কথা তার সপ্তাহখানেক বা দিনদশেক বাদেও ফিরেছেন। কোনও খবর দেবার প্রয়োজনও মনে করেননি। সোহিনীর মাকে অনেক কষ্টে সান্ত্বনা দিলাম এই বলে যে এক্‌জিবিশন আরও কয়েকদিন এক্সটেনড্‌ করেছে, তাই ওদের ফিরতে দেরি হচ্ছে। ফোন খারাপ আছে বলে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। অপেক্ষা করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও রাস্তা নেই। ঠিক পনেরো দিন বাদে সোহিনী ফিরেছিল মাসিমাই আমাকে ফোন করে খবর দিয়েছিলেন। মেয়ে ফেরার পরেও কোনও উচ্ছ্বাস দেখলাম না ওঁর গলায়। এবং আরও চিন্তিত। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করাতে বললেন সোহিনী নাকি ফেরার পর থেকে কোনও কথাই বলছে না। একেবারে বিধ্বস্ত চেহারায় নাকি ফিরেছিল। জেটল্যাগের অজুহাতে দুদিন চুপচাপ শুয়েছিল। কি হয়েছিল, কেন দেরি হল এসব জিজ্ঞাসা করতে গেলেই রেগে যাচ্ছে। বেশিরভাগ সময়েই স্টুডিওর দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে রয়েছে। আমাকে বারবার করে যেতে বললেন, যদি আমি ওর কাছ থেকে কিছু কথা বের করতে পারি। কারণ মেয়েকে নিয়ে উনি ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছেন। আমি কথা দিলাম দিনকয়েকের মধ্যে অবশ্যই যাব। এটাই বোধহয় আমার ভুল হয়েছিল।' প্রবাল বিষণ্ণ গলায় বলল।

'কেন?' দেবর্ষি জানতে চাইল।

'একটু চেষ্টা করে যদি সেইদিনই যেতাম হয়তো কিছু ব্যবস্থা করতে পারতাম সোহিনীর মা ফোন করার ঠিক তিনদিনের মাথায় সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফিরেছি—দারোয়ান এসে আমাকে একটি চিঠি দিয়ে গেল। আমি খামটা উলটে-পালটে দেখলাম ওপরে শুধু আমার নাম লেখা রয়েছে, কে পাঠিয়েছে তা কিছু লেখা নেই দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করাতে বলল, দুপুরবেলা একজন অল্পবয়সী মেয়ে এসে এটা দিয়ে গেছে। চেহারার যা বর্ণনা শুনলাম স্পষ্ট বুঝলাম সোহিনী ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না। অদ্ভুত একটা উত্তেজনা, সঙ্গে আশঙ্কা জন্মাল মনে। দারোয়ানকে যেতে বলে অফিসের জামাকাপড় না ছেড়েই চিঠিটা নিয়ে বসলাম। কয়েক পাতার লম্বা চিঠি। দাঁড়া এখনও আছে চিঠিটা আমার কাছে, তোকে দেখাই।'

প্রবাল উঠে গিয়ে আলমারির নির্দিষ্ট জায়গা থেকে চিঠিটা নিয়ে এসে দেবর্ষির হাতে দিল। দেবর্ষি দেখল ছবির মত সুন্দর অক্ষরে মৃত্যুকালীন জবানবন্দী!

প্রবাল,

এভাবে আমার চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছ। অনেক ভেবেই তোমাকে এ চিঠি লেখা। নিজের কাছে নিজেই অবাক হচ্ছি, এই অল্পদিনের পরিচয়ে কি এমন ঘনিষ্ঠতা তোমার সঙ্গে যাতে এসব বলার জন্য আর অন্য কারও কথা মনে পড়ল না তুমি হয়তো মনে মনে ভাবছ এও শিল্পীদের খামখেয়ালিপনার নমুনা মাত্র। কিন্তু আমি জানি আমার খেয়ালি মনের চূড়ান্ত প্রতিফল আমি হাতে হাতে পেয়ে গেছি—কাজেই এখন যেটুকু বাকি আছে, তা হল নির্মম বাস্তব। মনে আছে প্রবাল, তোমার সঙ্গে একদিন আমার দীর্ঘক্ষণ কথা হয়েছিল! তুমি একটা প্রশ্ন করেছিলে আমায় যার সঠিক কোনও উত্তর আমি দিতে পারিনি। কিন্তু এটুকু বুঝেছিলাম, কেন ওই প্রশ্ন করছ তুমি। হয়তো

আমার বিবেককে আঘাত দিতেই। হয়তো আমার শিল্পীসত্তার মৌলিকতাকে উজ্জীবিত করতেই। কিন্তু প্রবাল, আমি বোধহয় তখন আমার সেই কোমল শিল্পীমনকে হারিয়ে ছিলাম—যার জন্ম হয়েছিল আমার বাবার হাত ধরে, তাঁরই প্রেরণায়। সোজা কথায় লোভী হয়ে পড়েছিলাম! খ্যাতির লোভ, অর্থের লোভ, বিখ্যাত হবার লোভ! তারই ফলে তোমাদের সবাইকে অস্বীকার করতে শুরু করেছিলাম। তুমি, পারমিতা, এমনকি নিজের মাকেও অবিশ্বাস করেছিলাম। আজ তার পরিণাম আমার সামনে হাজির। তোমাদের সন্দেহই ঠিক ছিল। যে মানুষটা আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল, সে নির্ভেজাল ছিল না। যার হাত ধরে আমি অন্ধের মত এগিয়েছিলাম, কিছুদূর গিয়েই আমার পা পিছলে গেল। হ্যাঁ স্বীকার করছি, সম্পর্কের গঠন ধীরে ধীরে পালটে গেছিল আমাদের মধ্যে। বয়সের পার্থক্য প্রচুর হওয়া সত্ত্বেও অদ্ভুত এক উত্তেজনায় সেসব ভুলে গিয়েছিলাম। তাছাড়া ওঁর নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব এসবকে সত্যি মনে করেছিলাম। ভেবেছিলাম সত্যিই হয়তো আমার সাহচর্য ওঁকে জীবনকে ভালবাসতে সাহায্য করবে। আর ওঁর সান্নিধ্য আমাকে আশ্রয় দেবে। সব ভুল ভেবেছিলাম প্রবাল। সব ভুল। এসব ছিল মিথ্যে, অভিনয়। আজ আমি শেষ হয়ে গেছি প্রবাল। যে ব্যাঙ্গালোর থেকে আমার জীবন শুরু হবে ভেবেছিলাম, সেই ব্যাঙ্গালোরেই আমার মৃত্যুবীজ পোঁতা হয়ে গেল। বি.কে. আমাকে বুঝিয়েছিল স্ত্রীর সঙ্গে জীবন দুর্বিষহ হয়ে গেছে ওঁর। স্ত্রীর কাছ থেকে মুক্তি চায় ও। আমাকে আঁকড়ে ধরেছিল, বলেছিল, আমাকে ছাড়া বাঁচবে না। বিশ্বাস করে নিজেকে ওর হাতে তুলে দিয়েছিলাম। এতটুকু গ্লানি বোধ করিনি। কারণ নিজের কাছে পরিষ্কার ছিলাম, আমি ভালবেসে এসব করছি। এবং কাউকে ভালবাসলে তাকে অদেয় কিছু থাকে না। ব্যাঙ্গালোরে প্রথম দিন থেকেই ওর সঙ্গে একসঙ্গে ছিলাম। ও কথা দিয়েছিল ফিরে এসেই স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্সের কেসটা শুরু করবে। কিন্তু এখানে আসার পর প্রথম কয়েকদিন ও যোগযোগই করল না আমার সঙ্গে। আমি এমনিতেই গোটা ব্যাপারটায় একটু আপসেট ছিলাম। এতে আরও চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কারণ যেভাবে স্বামী-স্ত্রীর মত জীবনযাপন করেছিলাম ওই পনেরো দিন, তাতে অন্য কিছুও ঘটতে পারে, এই ভয় আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। তাই চাইছিলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডিভোর্সের ব্যাপারটা মিটিয়ে আমাকে সামাজিকভাবে স্ত্রীর সম্মান দিক। একদিন সরাসরি ওর বাংলোয় চলে গেলাম। আমাকে দেখে প্রথমে চমকে উঠলেও পরে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। ওর এই চমকানোটাতেই আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল। আমাকে বলল, এভাবে চলে না এসে আমাকে ফোন করলে না কেন? আমি ওকে বললাম, না এসে পারলাম না। তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছিল। ও কিছু বলল না উত্তরে। আমিই জিজ্ঞাসা করলাম, ডিভোর্সের ব্যাপারটা কি করলে? ও খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, ওর স্ত্রী বলেছে ওকে ডিভোর্স দেবে না! আমি চমকে উঠলাম কথাটা শুনে। ভীষণ ভেঙে পড়লাম। ও সান্ত্বনা দিয়ে বলল, এতে ভেঙে পড়ার কিছু নেই। কারণ ও সত্যিই আমাকে ভালবাসে। তাছাড়া ওর স্ত্রীর সঙ্গে যখন শারীরিক, মানসিক কোনও সম্পর্কই নেই, তখন ডিভোর্স দিক বা না দিক তাতে কিছু যায় আসে না। আমি অবাক গলায় বললাম, তাহলে আমার কি হবে? ও বলল আমাকে নিয়ে বিদেশে চলে যাবে। ওখানে আমরা একসঙ্গে থাকব। আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, আমার পরিচয় কি হবে? ও স্পষ্ট গলায় বলল, অফকোর্স

মিসেস কুণ্ডু! আমি বললাম, সে তো মিথ্যে পরিচয়। ও কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, বিদেশে এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। আমি তখন কেঁদে ফেললাম। ব্যাঙ্গালোরে ওর দেওয়া কথাগুলো মনে করিয়ে বললাম, কিন্তু তুমি তো বলেছিলে আমাকে কলকাতাতেই বিয়ে করবে। এখানেই আমরা থাকব। বিদেশে গেলে তো আমার কারও সঙ্গে যোগাযোগই থাকবে না। ওখানে তো আমি হারিয়েও যেতে পারি। ও তখন ওর সেই ভুবনভোলানো হাসিটা হেসে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, তুমি শিল্পী এটা ভুলে যেয়ো না। আর পাঁচটা পাতি বাঙালী মধ্যবিত্তের মত ভাবনাচিন্তা তোমার হওয়া উচিত নয়। শিল্পীরা কখনও শরীর, মর্যাদা এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাদের কাছে মুহূর্তটাই সত্যি। তাছাড়া কোন্‌টা সত্যি—কাগজের একটা সই, নাকি আমাদের ভালবাসা?

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, কিন্তু এখন যদি আমি প্রেগন্যান্ট হয়ে যাই? অসম্ভব স্মার্টনেসের সঙ্গে উত্তর দিল, 'এটা কোনও সমস্যাই নয়। এর জন্য দুটো রাস্তা খোলা আছে। এক, ভালভাবে বাচ্চাটাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসা। দুই, তোমার শরীর থেকে ওটাকে ভালভাবে সরিয়ে দেওয়া। যেটা তুমি চাইবে—তবে আমার মনে হয় দ্বিতীয়টাই আমাদের পক্ষে ভাল হবে! আমার আর বুঝতে কিছু বাকি রইল না। শুধু ওকে বললাম, তুমি আমার জীবনের প্রথম পুরুষ। আমি বুঝতে পারিনি তুমি আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করবে। এখন তো আমার মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটাই প্রি-প্ল্যানড। আমার এ কথায় ও একটু রেগে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে বিরক্ত গলায় বলল, আমার মনে হয়েছিল শরীর সম্পর্কে তোমার কোনও প্রেজুডিস নেই। তাছাড়া তুমি সাবালিকা। আমি জোর করে তোমার সঙ্গে কিছু করিনি। নিজের ভালমন্দ বোঝার বয়স নিশ্চয়ই তোমার হয়ে গেছে। তবে তুমি এত চিন্তিত হচ্ছ কেন বুঝতে পারছি না। আমার স্ত্রী আমাকে ডিভোর্স না দিলেও তো অসুবিধে কিছু হচ্ছে না। তোমাকে তো বললামই, তোমার সব রেসপনসিবিলিটি আমার, এর বেশি আমি কিছু বলতে পারব না।

প্রবাল, বুঝতেই পারছ ঠাণ্ডা মাথায় বি.কে. আমাকে ব্যবহার করেছে, আর আমি নির্বোধের মত ব্যবহৃত হয়েছি। নিজের কাছে আমার জবাব দেবার মত আর কিছু নেই। মায়ের সামনে দাঁড়াতে পারছি না, কারণ মায়ের কষ্ট আমি সহ্য করতে পারব না। তোমাদের সকলকে আমি ভুল বুঝেছিলাম। পারমিতার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলাম, তার জন্য আমি লজ্জিত। তোমরা করুণা করেই আমাকে ক্ষমা করে দাও। পারলে মাকে দেখো। তোমাদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি চললাম।

ইতি সোহিনী।

পড়া শেষ করে চিঠি হাতে নিয়ে দেবর্ষি থম্ মেরে বসে রইল। প্রবালের দিকে তাকিয়ে দেখল ও একমনে ধোঁয়ার রিং বানাচ্ছে। ঘরে অদ্ভুত এক নীরবতা বিরাজ করছিল। যেন বাতাস এসে থমকে রয়েছে। আর ওই ভারী বাতাসে ধোঁয়ার রিংগুলো আটকে আটকে যাচ্ছে, তারপর ধীরে ধীরে জট ছাড়াচ্ছে। অনেকক্ষণ পরে দেবর্ষি মুখ খুলল, 'কি করলি তারপর?'

সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিয়ে প্রবাল বলল, 'পারমিতাকে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম। বাড়িতেই পেয়ে গেলাম ওকে। বুঝতে পারছিলাম না, কোনও বিপদ তখনই

ঘটে গেছে কিনা। তাই সোহিনীর বাড়িতে আর ফোন করার সাহস হল না। পারমিতাকে সোহিনীর বাড়িতে যেতে বলে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি আমার আগেই পারমিতা পৌঁছে গেছে। মাসিমা তো আমাদের দুজনকে ওভাবে দেখে একটু অবাকই হয়ে গেলেন। কিন্তু অদ্ভুতভাবে উনি বাড়িতে থেকেও কিছু আঁচ করতে পারেননি। আমি কীভাবে কি বলব বুঝতে পারছিলাম না। কোনমতে জিজ্ঞাসা করলাম, সোহিনী কোথায়। মাসিমা ভারী গলায় বললেন, দুপুরের দিকে কোথায় বেরিয়েছিল, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে এসেছে। কিন্তু অন্যদিনের মতই কোনও কথাবার্তা না বলে নিজের স্টুডিওতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। উনিও আর বিরক্ত করেননি, কারণ কথা বলতে গেলেই সোহিনী হয় চুপ করে থাকে, নাহলে অকারণে উত্তেজিত হয়ে যায়। আমি আর কোনও কথা বলে সোজা চলে গেলাম সোহিনীর স্টুডিও-র দরজায়। বারকয়েক ডাকার পরও সাড়া এল না ভেতর থেকে। আমার তো হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। পারমিতা আমাকে দেখে কিছু একটা আঁচ করেছিল, ও তাড়াতাড়ি এসে আমার পাশে দাঁড়াল। দরজায় শব্দ করে ও-ও বারকয়েক ডাকল। কোনও সাড়া নেই। আমি আর কোনও রিস্ক না নিয়ে সোজা দরজা ভাঙার সিদ্ধান্ত নিলাম। মাসিমা ইতিমধ্যে কিছু আন্দাজ করে সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। বেশ কিছুক্ষণ ধাক্কাধাক্কির পর দরজার লক ভাঙা গেল। ছুটে ভেতরে ঢুকে দেখি সব শেষ হয়ে গেছে। ওর স্টুডিও-র একপাশে একটা ছোট সোফা ছিল। তাতে চুপচাপ ঘুমিয়ে আছে সোহিনী। চিরদিনের মত।'

প্রবালের গলা জড়িয়ে আসে। চোখ বন্ধ করে খানিকক্ষণ বসে থাকে। বন্ধ চোখের পাতায় সেদিনের ঘটে যাওয়া দৃশ্যগুলি পরপর ফুটে ওঠে। সে-ই কাছে গিয়ে প্রথমে সোহিনীর নাকের নিচে হাত দিয়ে দেখে, তারপর পালস দেখে হাতটা আগের জায়গাতে নামিয়ে রেখেছিল। সোহিনীর দেহ তখন নিথর, শীতল। অদ্ভুত কোমল আর পবিত্র দেখাচ্ছিল সোহিনীকে। কোনও কালিমার স্পর্শ সেখানে ছিল না। ক্যানভাসে শেষ তুলির আঁচড় দেওয়া ছিল, 'আমি হেরে গেলাম!'

চোখ খুলে প্রবাল বলে, 'এরকম পরিস্থিতিতে তো আগে কখনও পড়িনি। কি করব বুঝে উঠতেই সময় চলে যাচ্ছিল। একদিকে মাসিমা পাগলের মত করছেন, সোহিনীকে আঁকড়ে ধরে অঝোরে কেঁদে যাচ্ছেন, অন্যদিকে থানায় খবর দেওয়া—আইনি ব্যাপার-স্যাপার সব সামলানো। পারমিতাকে রেখে আমিই বেরোলাম। ধীরে ধীরে পাড়া-প্রতিবেশীরাও সকলে আসতে শুরু করল। তবে যে-কোনও কারণেই হোক, আইনি ঝামেলা খুব একটা ফেস করতে হয়নি। রুটিন একটা পোস্টমর্টেম-এর পর সোহিনীকে আমাদের হাতে তুলে দিল। তারপর শ্মশানে গিয়ে সব শেষ!' প্রবাল গভীর একটা শ্বাস ফেলল।

প্রবালের মনে পড়ে সোহিনীর সব কথা বলে ফেলার পরে সেদিন সন্ধেবেলায় ওরা দুজন ভরপুর মদ খেয়েছিল। কে যে কতটা খাচ্ছে, তার হিসেব ছিল না। বহুদিন পর এরকম মাত্রাছাড়া ড্রিঙ্ক করেছিল প্রবাল। পার্টিতে ডেকোরাম মেনটেন করতে বা এক-আধদিন বারে গিয়ে দু-এক পেগ ড্রিঙ্ক সে হামেশাই করে থাকে। মাপা-জীবনে পানের আনন্দটুকুও মাপ-মতই করতে অভ্যস্ত সে। তাই হিসেবের মধ্যে থাকতে থাকতে

বেহিসেবী হবার মজাটাই ভুলে বসেছিল সে। সেদিনের বেহিসেবী মদ্যপান প্রবালকে কাবু যদিও খুব একটা করতে পারেনি, কিন্তু অদ্ভুত এক প্রশান্তি দিয়েছিল। সে প্রশান্তির মধ্যে কতকিছুর সংমিশ্রণ ঘটেছিল! আনন্দ, বেদনা, জ্বালা, হতাশা—সর্বোপরি ব্যাখ্যাতীত এক বিরহবোধ। সেটা যে ঠিক কীসের জন্য, কার উদ্দেশে তা বুঝতে পারছিল না কিন্তু যন্ত্রণার উলটো-পিঠে যে এমন মধুর শান্তির ছোঁয়া থাকে তা সে এর আগে অনুভব করেনি। তবে সে দিনটা ব্যতিক্রম ছিল, শুধু মদ্যপানটুকুই নয় সবমিলিয়েই দিনটা প্রবালের কাছে অন্যরকম ছিল। দীর্ঘদিন বাদে পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা, মন খুলে কথা বলা—এসবই দিনটাকে আলাদা করে দিয়েছিল। তাছাড়া এর আগে প্রবালের ফ্ল্যাটে এত দীর্ঘক্ষণ কেউ কাটিয়ে যায়নি। রাতের নেশা পরদিন ঝেড়ে ফেলে অবশ্য যে যার কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল সকালেই। আবার সেই গতানুগতিকতায় ফিরে যাওয়া। তবে প্রবাল অনুভব করে ওই এক-আধটা ব্যতিক্রমের দিন কিন্তু নিয়মগুলোকেই আরও সুন্দর করে তোলে। আর এই বাধ্যবাধকতার জগৎটাই শ্রীযুক্ত প্রবাল রায়কে যে বাঁচিয়ে রেখেছে এ বিষয়ে তার কোনও সন্দেহ নেই। কোম্পানির প্রফিট অ্যান্ড লসের মার্জিনটা নিজের অজান্তেই কখন তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। কোম্পানির লেনদেনের হিসেব এখন তার শ্বাস-প্রশ্বাসে জড়িয়ে। এর থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারে না প্রবাল। বিপিন কুণ্ডুকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করলেও সে-ই এখন তার রিজিওনের সর্বেসর্বা। এও বোধহয় প্রবালের সঙ্গে তার ভাগ্যের আর এক নিষ্ঠুর পরিহাস। তবে সুখের কথা, সোহিনীর ঘটনাটা যেভাবে হোক লোকটাকে ধাক্কা দেওয়ায় বেশির ভাগ সময় ভারতবর্ষের বাইরেই কাটায় লোকটা। ওর স্ত্রী লাবণ্যের সঙ্গে অবশ্য প্রবালের মাঝেমধ্যে যোগাযোগ হয়। এই লাবণ্য কুণ্ডুও প্রবালের দেখা আর এক বিস্ময়। বি.কে. কোনভাবেই ওই মহিলার নখের যোগ্য নয়, সেটা বুঝতে প্রবালের বেশি সময় লাগেনি। সোহিনীর ঘটনাটা সম্পূর্ণ জানার পরেও ভদ্রমহিলা অদ্ভুত নীরবতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। নিজের স্বামীকে ভালভাবেই জানতেন তবুও প্রবালের শত অনুরোধেও সে ব্যাপারে মুখ খোলেননি। আর পাঁচটা সাধারণ মহিলার মত পতি-ভক্তির কারণে যে এরকম করেছিলেন তা কোনভাবেই নয়, কিন্তু যথেষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা হওয়া সত্ত্বেও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে বি.কে.-র সমস্ত অপকর্ম নীরবে সহ্য করে যান।

কাজ নিয়ে আবার আগের মত ব্যস্ত থাকলেও দেবর্ষির সঙ্গে যোগাযোগটা তারপর থেকে রয়ে গেছে। মাঝেমাঝেই সন্ধের পর অথবা ছুটির দিনে দেবর্ষি চলে আসে প্রবালের ফ্ল্যাটে। সিনেমা জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হলেও প্রবাল দেখেছে কাজের বাইরে দেবর্ষি কিন্তু ওই জগতের সঙ্গে খুব একটা যোগাযোগ রাখতে চায় না, অবসর সময়টা নিজের মত করেই কাটায়। দু-একজন ঘনিষ্ঠ ছাড়া কাজ শেষ হলে যে যার নিজের বাড়িতেই ফিরে যায়। নিজের মধ্যে একটু গুটিয়ে থাকার অভ্যেসটা ওর এখনও আছে। তবে দেবর্ষির এ স্বভাবটা প্রবালের ভালোই লাগে। জীবনের সবটুকুই সকলের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া নয়, নিজের জন্যেও কিছু রেখে দেওয়াটা প্রবালের নিজেরও পছন্দ। সারাদিনের কাজের শেষে এক নির্বিকার নিরাসক্ত ভঙ্গিতে একটু দূরে দাঁড়িয়ে জীবনটাকে দেখা। প্রবাল দেখেছে এই নীরব পর্যবেক্ষণ অনেকটা আত্মসমীক্ষার কাজ করে। পাঁকগুলোকে দূরে সরিয়ে পরিষ্কার জলটাকে চেনার পথ করে দেয়।

সর্বোপরি আশেপাশের মানুষগুলো, যাদের সঙ্গে নিত্য ওঠা-বসা কিংবা পরিচিতির বৃত্তে সদ্য পা-রাখা মানুষটাকেও জরিপ করে নিতে সাহায্য করে।

তবে প্রবাল আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করে, এসমস্ত সমীকরণের পুরোটাই মাত্রাতিরিক্ত সচেতনতার ফসল। এর মধ্যে আবেগ-উচ্ছ্বাসের জায়গা বড়ই কম। সুযোগও কম। তবে কলেজ-জীবনের ফুটন্ত দিনগুলোর সঙ্গী হওয়ায় দেবর্ষির সঙ্গে আড্ডামারাকালীন অনেকসময়ই দুজনে সেসব পুরোনো আবেগের শিকার হয়। যদিও খুবই সাময়িক সেসব মুহূর্ত। আর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর অফিসের কাজ বাদে প্রবালের সেরা অবসর বিনোদনের ক্ষেত্রই হল স্মৃতির সাগরে ডুব দেওয়া। শুধু কলেজ জীবনই নয়, ছোট্টবেলার কত তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাও এর ফলে হঠাৎ হঠাৎ ছবির মত ভেসে ওঠে চোখের সামনে। কত সামান্য ঘটনা, কত সাধারণ পরিপ্রেক্ষিত এখন নতুন অর্থ বয়ে এনে দেয় তার কাছে। হিসেবনিকেশগুলো ঝালিয়ে নিতে সাহায্য করে। অস্বচ্ছ মানবচরিত্রগুলো অনেক স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। অস্পষ্ট আচরণগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্য কেউ দূরের কথা, প্রবাল তার জন্মদাতা-জন্মদাত্রীর কথা ভাবলেই অবাক হয়ে যায়, কি অদ্ভুত সমীকরণে এদের সহাবস্থান ঘটে চলেছে। জ্ঞান হওয়া ইস্তক প্রবাল তার বাবা-মাকে সহজভাবে কথা বলতে কখনও দ্যাখেনি। সবসময়ই একটা চাপা টেনশন বাড়ির আবহাওয়াটাকে ভারী করে রাখত। তারা তিন ভাইবোন কোনদিনই খোলামেলাভাবে আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের মত বড় হতে পারল না। পারিবারিক ঐতিহ্য, ব্যক্তিগত অহমিকা আর দুই অসম ব্যক্তিত্বের লড়াই-এর শিকার তাদের শৈশব। রক্তের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও আশ্চর্যজনকভাবে প্রবাল কোনদিনই সেরকম টান অনুভব করেনি ওই মানুষগুলোর প্রতি। তবে কষ্ট হত দাদার কথা ভাবলে কিংবা বোনের অবস্থা দেখলে। বরাবরই দাদার ভালোমানুষির সুযোগ নিয়ে তাকে নিজের ইচ্ছেমত ব্যবহার করেছেন শ্রীযুক্ত পতিতপাবন রায়। তাঁর অঙ্গুলিহেলনেই নির্দেশিত হত বড়ছেলের দৈনন্দিন জীবন। আর পল্লবী তো চরম অবহেলার শিকার। অপ্রাপ্ত মনের অধিকারী সেই ছোট্ট মেয়েটা বাড়ির ঝি-চাকরদের পায়ে-পায়েই ঘুরত। তার জন্মদাত্রীর কথা ভাবলে প্রবাল অবাক হয়ে যায়। এরকম কর্মহীন, অলস, মস্তিষ্কশূন্য মহিলা প্রবাল আর দুটো দ্যাখেনি। স্বামীর প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যে টান না থাকার অনেক জটিল দুর্বোধ্য কারণ থাকতে পারে, কিন্তু নিজের সন্তানদের প্রতি! সন্তানদের ঠিকমত প্রতিপালন না করে অর্থের বিনিময়ে রাখা কিছু অযোগ্য লোকের হাতে ছেড়ে দেওয়াটা কোন্ মনুষ্য অনুভূতির পর্যায়ে পড়ে প্রবাল ভেবে পায় না। শুধুমাত্র অধিকারবোধ ছাড়া অন্য কোনও অনুভূতি তার সন্তানদের ওপর কাজ করত বলে প্রবালের মনে হয় না। পরিমল বা পল্লবী নির্বিবাদে তার কাছে আত্মসমর্পণ করত কিন্তু প্রবাল ছোট থেকেই একরোখা। ঈশ্বরের অশেষ করুণা বলে মনে হয়, আজ পল্লবী একেবারে সুস্থ এবং পরিমলও ওই অভিশপ্ত পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। প্রবাল এখন মাঝেমধ্যেই ভাবে, ঠিক কীভাবে দিন কাটাচ্ছে পতিতপাবন রায় বা তার মাতৃদেবী বনলতা। সে নিজে বরাবরই খরচার খাতায় ছিল, কিন্তু দাদা-বউদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়াটা যে রায়-পরিবারের ঐতিহ্যে একটা বিরাট ধাক্কা দিয়েছে একথা সহজেই অনুমেয়।

রায়-বাড়িতে জীবন চলছিল তার স্বাভাবিক নিয়মেই, যে ছন্দে বা যে গতানুগতিকতা
এতদিন চলে এসেছিল নির্দিষ্ট সেই ছন্দেই। চাকর-বাকরদের আনাগোনা, পতিতপাবনে
হুঙ্কার, বনলতার আস্ফালন, ঝরনা আর কালোর মার অম্লমধুর বাক্যালাপ, গুরুপদর খব
আদান-প্রদান ইত্যাদি নৈমিত্তিক কর্মধারায়। দৈনন্দিনের এই কর্মযজ্ঞ নির্দিষ্টভাবে বেজে
চললেও কিছু স্বতন্ত্র সুরের অভাবে কেমন যেন বেসুরো বেতালা আর সামান্য হলে
খাপছাড়া ভাবে বাজছিল। তবে বৈচিত্র্যহীনতায় এ বাড়ির সকলেই অভ্যস্ত। পর
নিস্তরঙ্গ বদ্ধ জলায় সামান্য একটা পাতা পড়লেও যে তরঙ্গমালার সৃষ্টি হয়, এ বাড়িে
সেরকম কিছু ঘটলেই বেশ একটা হইচই পড়ে যায়। পরপর বেশ কদিন তা নি
আলোচনা, ঘটনা-পরম্পরার চুলচেরা বিশ্লেষণ, স্ব স্ব মতামত প্রদান এবং বিষয়ের স
সম্পর্কযুক্ত কাল্পনিক কোনও ঘটনার আশ্চর্য সব নিদান। গোলেমালে এসব নিয়েই রা
পরিবারের অন্দরমহল চলছিল। কিন্তু গোকুলে বাড়ার মত করে এসবের আড়ালেই এক
একটু করে আত্মসচেতন এবং আত্মনির্ভর হয়ে উঠছিল পল্লবী। দুই দাদার বাড়ি থেকে
বেরিয়ে যাওয়া তার মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। অপরিণত মন নিয়েই পল্লবী বুঝ
তাকে নিয়ে যেটুকু ভাবার তা ভাবে দাদারাই। বাবার সঙ্গে তো তার এযাবৎ যতগুলে
কথা হয়েছে সে হাতে গুনে বলে দিতে পারে। আর রইল মা। কিন্তু পল্লবীর স্মৃতিে
মায়ের মুখঝামটা, ঔদাসীন্য এবং বিরক্তি ছাড়া অন্য কোনও অভিজ্ঞতা প্রায় নে
বললেই চলে। এক আছে মায়ের ডান হাত ওই ঝরনা। সে-ই কোলে-পিঠে ক
পল্লবীকে বড় করে তুলেছে বলা যায়। আজ অবধি তার যেটুকু খোঁজখবর রাখার
রাখে ওই ঝরনাই। সিনেমার গুলি খাইয়ে যখন তাকে ভুলিয়ে রাখা হয়েছিল তখনও ও
ঝরনাই ছিল তার সঙ্গী। আর একজনের কথাও অবশ্য না বললেই নয়। সে হল ত
বাবার চামচা শিবনাথকাকা। অবশ্য লোকটাকে ঠিক বুঝতে পারে না পল্লবী। ও ক
দলে? বাবার না মায়ের? বরাবর সে দেখে আসছে মায়ের ঘরে অবারিত দ্বার লোকটার
দিন নেই দুপুর নেই রাত্রি নেই যখন খুশি মায়ের ঘরে গিয়ে গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুস
করে দীর্ঘক্ষণ। ওই সময়টায় মায়ের ঘরে কারও যাওয়া বারণ। এমনকি মায়ের খা
লোক ঝরনাও সে সময় অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়। তার থেকেও বিস্ময়ের, অম
দোর্দণ্ডপ্রতাপ বাবা তার, তিনিও এ ব্যাপারে আশ্চর্য উদাসীন! ব্যাপারটা সত্যিই দুর্বো
লাগে তার। দৈনন্দিনের এই ঘটনাগুলো আগে পল্লবীর মনে প্রভাব ফেলত ন
এগুলোকে সে ব্যতিক্রম বলে বুঝত না, তার অভ্যস্ত চোখে এগুলো ছিল একেবারে
স্বাভাবিক। কিন্তু এখন পল্লবী এসব নিয়ে ভাবে। অনন্ত অবসর তার। বাড়ির প্রতি
চরিত্রকে নিয়ে গভীরভাবে ভাবা এখন তার একটা বড় কাজ। বিশেষত নাটকের প্রধ
কলাকুশলীদের নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সে আজকাল। বাবা লোকটাে
মনুষ্যচরিত্রের ব্যতিক্রম বলেই মনে হয় তার। আবেগ-অনুভূতিহীন যন্ত্রবৎ একটা মানু
মাঝেমাঝে তো পল্লবীর লোকটাকে হিংস্র জল্লাদ লাগে! নাহলে নিজের ছেলেদে
কেউ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করে! মামলা-মোকদ্দমা আর কাঁড়ি কাঁড়ি টা

রোজগার করা ছাড়া লোকটার যেন আর কোনও কাজ নেই। কিন্তু তার মধ্যেও কোনও আনন্দ পায় বলে তো পল্লবীর মনে হয় না। আর পেলেও সে আনন্দের ভাগ কাউকে দিতে চায় না। পল্লবীর টাকা-পয়সার প্রয়োজন হয় না কিন্তু দুই দাদাকেও তো বাবা তাঁর সম্পত্তির শরিক করতে চায়নি। ছোড়দার না হয় দরকার নেই, কিন্তু বড়দার জন্য পল্লবীর কষ্ট হয়। বউদিকে ওর ভালই লাগত। কিন্তু সেই বউদিকেও মা টিকতে দিল না। এখন যে ওরা বেশ কষ্টেই আছে বোঝে পল্লবী। যেদিন বড়দা বাগবাজারের বাড়িটার ব্যাপারে তার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল, পল্লবী অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার যে এ বাড়িতে এতখানি গুরুত্ব আছে সে জানতই না। দাদা বাড়িটা ভাড়া নেওয়ার ব্যাপারে তার অনুমতি চাইতে এসেছিল, বলেছিল, লিখিত অনুমতি দরকার। বাবা নাকি সেইরকমই দাবি করেছেন। পল্লবী গোটা গোটা অক্ষরে লিখে দিয়েছিল, দাদাকে দিলে তার কোনও আপত্তি নেই। ভীষণ মায়া হয়েছিল দাদাকে দেখে তার। তবে এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতেই নিজের অজান্তেই কখন যেন সে অনেক পরিণত হয়ে উঠেছে। ভেতর ভেতর এক আত্মবিশ্বাসের জন্ম হচ্ছিল। পল্লবী অনুভব করছিল তার জীবনটা এভাবে হেলায় হারাতে দেওয়াটা বোকামো হবে। তার জন্য কারও মাথাব্যথা না থাকতে পারে, তার নিজের এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা উচিত। বড়দাকে তাৎক্ষণিকভাবে তার প্রেসে কাজ করার কথা বললেও পল্লবী জানে তার অনেক দেরি আছে। একটা ব্যবসা শুরু করার যে প্রস্তুতি, দাদা সবে সেটা শুরু করেছে। ছোড়দার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলবে বলে ঠিক করে রেখেছে পল্লবী। তবে সে জানে তার এই ভাবনা-চিন্তার ছিটেফোঁটাও কেউ জানলে একটা ঝড় বয়ে যাবে বাড়িতে। সত্যিকারের কিছু করার আগে তাই সে কিছু জানতে দিতেও চায় না। তবে পল্লবী নিজেই আশ্চর্য হয়ে অনুভব করে এসবের জন্য বিন্দুমাত্র ভয় তার মনের মধ্যে কাজ করছে না। সে এখন দিব্যি মুখে মুখে কথা বলতে পারে। নিজের পছন্দ-অপছন্দ স্পষ্ট গলায় জানাতে পারে।

সকালবেলা নিজের ঘরে বসে পল্লবী এসব সাত-পাঁচ ভাবছিল। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকাতে দেখল নটা বেজে গেছে। এর মধ্যে তার এক গ্লাস হরলিক্স খাওয়া বহুদিনের অভ্যেস। ঝরনাই তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে যায়। ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ বসে থাকল পল্লবী, তারপর কি মনে হতে চেয়ার ছেড়ে উঠে মায়ের ঘরের দিকে পা বাড়াল। খুব এদিক-ওদিক না হলে ঝরনাকে ওখানেই সাধারণত পাওয়া যায়। বনলতার দরজার সামনে এসে পল্লবী ঘরের ভেতরে তাকিয়ে দেখল বনলতা ধোপার খাতার হিসেব দেখছে। ঝরনা বাধ্য মেয়ের মত সামনে দাঁড়িয়ে আছে। খাতায় চোখ বুলিয়ে বনলতা ওকে খাতা ফেরত দেয়। ঝরনা বলে, 'সব ঠিক আছে তো বড়মা?'

বনলতা মাথা নাড়ে, 'দেখে তো তাই মনে হল। তুই ভাল করে দেখে নিয়েছিস তো কাপড় দেবার সময়? পুরোনো লোক হলেও লোকটার একটু হাতটান আছে!'

ঝরনা বলে, 'হ্যাঁ, বড়মা, সবই তো গুনে দিলুম।'

'ঠিক আছে, তুই যা।' বনলতা পানের ডিব্বা কাছে টেনে নেয়।

এইসময় পল্লবী বড় বড় পা ফেলে ঘরে ঢুকল। সরাসরি ঝরনার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার ঝরনাদি, সকাল নটা বেজে গেছে, এখনও আমার হরলিক্স তো দিলে না?'

ঝরনা তড়িঘড়ি করে বেরোতে যায়, 'এই আসছি দিদিমণি। ধোপা এসেছিল তো, ওর হিসেবগুলো একটু বড়মাকে দেখিয়ে নিতে এসেছিলাম। ওকে বিদেয় করে দিয়েই আসছি তোমার হরলিক্স নিয়ে।'

পল্লবী আর কিছু না বলে মায়ের দিকে তাকায়। বনলতা মুখে এক ফোঁটা চুন ফেলে পানের বাটা সরিয়ে রাখে একপাশে। তারপর পাশে রাখা আরও দু-তিনটে খাতার মধ্যে থেকে একটা টেনে নেয়। মায়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে পল্লবী কি মনে হতে বনলতার বিছানায় এসে বসে। খাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে, 'মা—কি করছ গো?'

বনলতা বেজার মুখে বলে, 'কি আর করব বলো? রোজ সকালে আমার যা কাজ তাই করছি। ধোপার হিসেব, কাঁচা বাজারের হিসেব, মুদিখানার হিসেব এসব দেখছি। রাবণের সংসারে ঝক্কি তো কম নয়। এতগুলো মানুষ ঘোরাফেরা করছে, প্রতিদিন তাদের হাজার একটা দরকার—সেসব ঝক্কি তো আমাকেই পোয়াতে হয়। সবকিছুর হিসেব রাখা কি চাট্টিখানি ব্যাপার?'

পল্লবী মায়ের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে, 'তা যা বলেছ। হোক না জঙ্গল তবু রাজত্ব তো বটে! সামলানো কি মুখের কথা?'

বনলতা ঠিকরে ওঠে, 'মানে?'

'মানে না বোঝার মত তো কিছু বলিনি। তুমি বললে সংসারে এত লোক, তাদের ঝক্কি সামলানো কি চাট্টিখানি ব্যাপার! তাই বললাম। তুমি বলছ এ বাড়িতে এত লোক, তাদের সকলের কত রকমের ফরমাশ অথচ সেভাবে দেখতে গেলে দ্যাখো, এ বাড়িতে সাকুল্যে কিন্তু লোকের সংখ্যা তিনটি—তুমি, বাবা আর আমি।'

বনলতা গম্ভীর হয়ে যায়। খাতার হিসেবের দিকে মন দিয়ে বলে, 'তা আমার আর কি করার আছে? যাদের সংসার তারা যদি ফেলে দিয়ে চলে যায়, আমি কি তাদের পায়ে ধরে সেধে আনব? তাছাড়া তারা চলে গেছে বলে কি এ বাড়ির সব অচল হয়ে থাকবে? তা তো হবে না। ওরা হল সুখের পাখি। সুখের সন্ধানে উড়ে গেছে।'

পল্লবী মার দিকে তাকায়, 'আচ্ছা মা, তোমার কি মনে হয়, দাদারা যে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, তা কি ইচ্ছে করে? আর ওরা যে সব সুখে আছে বললে তা তুমি কী করে জানলে?'

বনলতা মেয়ের দিকে তাকায়। কিছু একটা বলতে গিয়েও সামলে নেয়। তারপর চোখ ছোট করে বলে, 'সুখে আছে বলিনি তো। বললাম সুখের সন্ধানে উড়ে গেছে। সুখে থাকাটা কি অতই সহজ নাকি? দেমাক দেখিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে বেড়িয়ে যাওয়াটা হয়তো সোজা কিন্তু সুখ অত সহজে আসবে না। কাউকে কষ্ট দিয়ে সুখী হওয়া যায় না। বাপের হোটেলে এতদিন ছিল, কপালে সইল না তা—এবার দেখবে কত ধানে কত চাল!'

পল্লবী অবাক হয়ে মাকে দেখছিল, ঠিক মনে হচ্ছে কোনও শত্রুপক্ষের লোকের সম্বন্ধে কথাগুলো বলছে। কেউ বুঝবে না এসব কথার লক্ষ্য তার নিজেরই ছেলেরা। পল্লবীর হঠাৎ মনটা তেতো হয়ে গেল। আর কথা না বাড়িয়ে উঠে এল মায়ের ঘর থেকে।

বনলতা মেয়ের যাওয়া দেখল। তার কথাগুলো যে মেয়ের পছন্দ হয়নি এটা

বুঝতে অসুবিধে হল না তার। তবে সেসব নিয়ে ভাবতে বিন্দুমাত্র উৎসাহী নয় সে। এই এক মেয়ে তার গলার কাঁটা হয়ে রয়েছে। দুই ছেলের পর মেয়ে হওয়ায় সকলে খুব খুশিই হয়েছিল। ঘরে নাকি লক্ষ্মীর আগমন হল। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল সেই আনন্দ আতঙ্কে পরিণত হতে দেরি লাগেনি। প্রথমে বোঝা যায়নি। অনেক বাচ্চারই পরিণতি একটু দেরিতে আসে। কিন্তু শরীরে বাড়তে লাগলেও পল্লবীর বুদ্ধি যখন স্বাভাবিক ভাবে বাড়ল না তখন বাড়িসুদ্ধ লোক হতাশ হয়ে পড়ল। তার ওপর ছোট থেকেই মেয়েটা একটু বেশিই জেদী। মাঝেমধ্যে এমন সব জিনিসের জন্য জেদ ধরত বাড়িতে একেবারে হুলুস্থুল পড়ে যেত। বনলতার এসব ঝামেলা সহ্য হত না। ওই ঝরনাই সামলাত সব কিছু। তবে মাঝেমাঝে ওই জেদ করা ছাড়া বাকি সময়টাতে পল্লবী নিজের মনেই থাকত সারাদিন। পড়াশুনোও এর ফলে হয়নি। চেষ্টা করা হলেও ওর পেছনে লেগে থাকার মত উদ্যোগ এ বাড়িতে কারও ছিল না। তাছাড়া ডাক্তারের বারণও ছিল কোনকিছু জোর করে ওর ওপর চাপিয়ে দেবার ব্যাপারে। পল্লবীর পড়াশোনায় কোনও উৎসাহ ছিল না। যেটুকু উৎসাহ বড় হওয়ার পর থেকে হয়েছিল তা সিনেমা নিয়ে। উত্তমকুমারকে নিয়ে ওর বাড়াবাড়ি তো একটা সাংঘাতিক জায়গায় চলে গিয়েছিল। এ বাড়িতে সিনেমার চল খুব একটা ছিল না। তবে পল্লবীকে ঠাণ্ডা রাখতে প্রায়দিনই ঝরনার সঙ্গে দুপুরবেলা ওকে সিনেমা দেখতে পাঠিয়ে দেওয়া হত। এমনও হয়েছে একেকটা সিনেমা ওর চার-পাঁচবার দেখা হয়ে গেছে। তবে বনলতা বোঝে পল্লবীর এই সিনেমা দেখার ঝোঁক তৈরি হওয়ার পেছনে সেই দায়ী। এ বাড়িতে সিনেমার পত্রিকা একমাত্র তার কাছেই আসে। আর মেয়েকে দোষ দেবে কি, উত্তমকুমারের ছবিওয়ালা বই নিয়ে কত অলস দুপুর সে নিজেই কাটিয়েছে। সিনেমার নায়ক-নায়িকা, গল্প, ছবি এসবের সঙ্গে পল্লবীর তাই ছোট্ট থেকেই পরিচয়। পড়ার বই ঘোরতর অপছন্দ হলেও লুকিয়ে-চুরিয়ে সিনেমার পত্রিকা পড়তে সে ওস্তাদ ছিল। মেয়েমানুষের পড়াশোনার ব্যাপারে বনলতারও তেমন উৎসাহ না থাকায় মেয়েকে অত শাসন-বারণও সে করেনি।

কিন্তু ইদানীং বনলতা লক্ষ্য করছে পল্লবীর কথাবার্তা বলার ঢংটা একটু বদলেছে। ব্যবহারেও বেশ গাম্ভীর্য এসেছে। ভাবনাচিন্তা করে কথা বলে। আর নিজে থেকেই নানারকম বই দাদাদের ঘর থেকে জোগাড় করে নিয়ে এসে পড়ে। মেন্টাল হোম থেকে ফিরে আসার পর ধীরে ধীরে এই পরিবর্তনগুলো ঘটতে দেখে বনলতার মাঝেমাঝে মনে হয় পল্লবী বোধহয় একেবারে ঠিক হয়ে গেছে। আবার একটা সন্দেহ মনের মধ্যে বাসা বাধে, এতদিনের একটা বিষয়ে এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না। আরও কিছুদিন দেখা যাক, তারপরে পল্লবীর ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ও মেয়ের বিয়ে দেওয়াটা যে সহজ হবে না তা বনলতা জানে। কারণ যারা ওর অতীত জানে তারা সাহস পাবে না এমন মেয়েকে ঘরের বউ করতে। যদিও একটা ব্যাপার বনলতা তার স্বল্প বুদ্ধি দিয়েও বোঝে, টাকা অনেক কঠিন সমস্যারও সহজ সমাধান করে দেয়। পতিতপাবনের টাকার অভাব নেই। তা দিয়ে মেয়ের জন্য একখানা ভাল পাত্র কেনার জোর তাঁর আছে। তাই এ নিয়ে বনলতা বিশেষ ভাবে না। তবে সময় থাকতে মেয়েকে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দেবার ইচ্ছেটা কিছুদিন ধরেই তার মাথায় ঘুরছে। সুযোগ বুঝে

কথাটা পতিতপাবনের কানে তোলার ব্যাপারটা এখন আবার ভেবে রাখল সে।

কিন্তু এ মুহূর্তে তার মনের ভেতরের জ্বালা বড় ছেলেকে নিয়ে। ওই ছোট ঘরের মেয়েটা যে শেষ অবধি ছেলেটাকে কব্জা করে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যাবে বনলতা এতটা ভাবেনি। বাগবাজারের নতুন বাড়ি ভাড়া দেবার অনুমতি দেওয়ার কোনওরকম ইচ্ছে তার ছিল না। প্রতিশোধ নেওয়ার ওই একটা সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু বাড়িসুদ্ধ সবাই অনুমতি দিয়ে বসায় তার কাজটা কঠিন হয়ে গেল। শেষ অবধি সকলেই তার দিকে আঙুল তুলত। বনলতা সে সুযোগ দেবার পাত্রী নয়। তাই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ছেলেকে অনুমতিপত্র লিখে দিতে হয়েছিল বটে কিন্তু মনের জ্বালাটা রয়েই গিয়েছিল। হিসেবের খাতাপত্র দেখতে দেখতে এসবই ভাবছিল বনলতা। খাতা দেখা শেষ হলে সেসব তুলে রেখে পা ছড়িয়ে বসল। তার জলখাবার খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। ঝরনাকে হাঁক দিতে যাবে এমন সময় দেখল পর্দা সরিয়ে শিবনাথ ঢুকছে। চোখে চোখ পড়তেই এক ঝটকায় মুখ সরিয়ে নিল সে। শিবনাথ তা দেখে হেসে ঘরে ঢুকে কাছে এগিয়ে এল। বনলতা তখনও মুখ ঘুরিয়ে। শিবনাথ এক গাল হেসে বলল, 'তুমি আর বড় হবে না বনো! সেই একেবারে ছোট্টবেলাটির মত হাবভাব তোমার এখনও রয়ে গেছে। তা অভিমানের কারণটা কি জানতে পারি?'

বনলতা ফুঁসে ওঠে, 'আমার অভিমানের কারণ জানবার জন্য তোমায় ছটফট করতে হবে না। তোমার এখন অন্য অনেক টান হয়েছে। খোঁজখবর করবার লোক হয়েছে। আমাকে দিয়ে আর তোমার কি কাজটি হবে যে তুমি আমার জন্য মাথা ঘামাবার সময় পাবে!'

'ও, এই কথা! তা সময় সত্যিই পাইনি বটে। কিন্তু তুমি তো জানো, আমায় হাজাররকমের ঝামেলায় ফেঁসে থাকতে হয়। তোমার কর্তার মতিগতি বুঝে কাজ করতে হয়। তোমার কাছে আসার জন্য ছটফট করলেও আসতে পারি না। তুমি ছাড়া আমায় কে বুঝবে বলো। না, এটা ভারি অন্যায়!' শিবনাথ অনুযোগের গলায় বলে।

বনলতা সেসব পাত্তা না দিয়ে আবার ফুঁসে ওঠে, 'রাখো তো তোমার এসব মনভোলানো কথা। আমার বয়সটা যে প্রতিদিন বাড়ছে সেটা বোধহয় তুমি ভুলে যাচ্ছ। আগের মত আর আমাকে যা খুশি বলে ভুলিয়ে রাখবে তা আর হচ্ছে না। তোমার বড়বাবুর কাজ করতে গিয়ে ফুরসত মেলেনি? মিথ্যে কথা কেন বলো, বলো তো এই বয়সে এসে?'

'মিথ্যে কথা!' শিবনাথ বিস্মিত হয়।

'মিথ্যে নয়? আমি খোঁজ নিয়ে দেখিনি ভেবেছ? তুমি মোটেই আর আগের মত বড়বাবুর হুকুম তামিল করে বেড়াও না। কোর্টের কাজও সেরকমভাবে দ্যাখো না। সত্যি করে বলো, তো তোমার নতুন টানটি কোথায়? কোথায় আখড়া বানিয়েছ আবার?' বনলতা চিবিয়ে চিবিয়ে জেরা করে।

'ওঃ বনো, তোমাকে নিয়ে আর পারি না! এমন সব কথা বলো না, রাগ হয়ে যায়! নেহাত আমি তোমার ওপর রাগ করে থাকতে পারি না তাই, না হলে এসব কথা শোনার পর তোমার কাছে আসার মনটাই নষ্ট হয়ে যায়।' শিবনাথ ক্ষুণ্ণ স্বরে বলে।

আপাদমস্তক লোকটাকে মাপে বনলতা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, 'কি হল,

াঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো।'

শিবনাথ অভিমানী চোখে তাকায়, 'তুমি যা বললে তাতে বসার আর ভরসা পাচ্ছি কই?'

বনলতা এবার একটু নরম গলায় বলে, 'বসো, আর ন্যাকামো করতে হবে না। আমার চেঁচানোটাই শুধু দেখলে, জ্বালাটা তো বুঝলে না! এই যক্ষপুরীতে আমার যে একা-একা আর ভাল লাগে না, সেটা বোঝো না? আগে দু-বেলা তুমি দেখা করে যেতে, যত দিন যাচ্ছে তোমার অবহেলা বাড়ছে। আমি কি কিছু বুঝি না ভেবেছ? তোমার কাছেও আমার আর কোনও দাম নেই। ভাগ্যটাই মন্দ আমার। না হলে এমন হবে কেন?'

শিবনাথ বিছানায় বসে। বনলতার দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোমার দোষ কি জানো তো বনো, যখন মেজাজ খারাপ থাকে তখন তুমি হুঁশ-জ্ঞান একেবারেই হারিয়ে বসো, না হলে আর সকলের সঙ্গে আমায় গুলিয়ে ফেলো কি করে? হাজারটা চিন্তার জট মাথায় নিয়ে তোমার কাছে আসতে ভাল লাগে না। এক তুমিই আছ যেখানে আমি মনের কথা বলে একটু হালকা হতে পারি। তাছাড়া তুমি কি এটাও বোঝো না, পরিস্থিতি আর আগের মত নেই যে যখন-তখন তোমার ঘরে চলে চলে আসব। একটু ভেবেচিন্তে আসতে হয়।'

বনলতা সন্দিগ্ধ গলায় বলে, 'কেন? কেউ বুঝি তোমাকে কিছু বলেছে?'

'ওই দ্যাখো, অমনি আবার কি ভেবে বসলে! কেউ কিছু বলতে যাবে কেন? যাকগে, ওসব কথা বাদ দাও, কিন্তু এসব কি শুনছি?' শিবনাথ চোখ নাচায়।

'কী শুনলে আবার? আমি তো এই চার-দেওয়ালের মধ্যেই বন্দী থাকি। আমার সম্বন্ধে নতুন করে কিছু শোনার কথা তো তোমার নয়। তাছাড়া সে বয়সও কি আর আছে? নতুন করে কিছু শুনতে পাবে?'

'ওঃ বাবা, তুমি পারো বটে! আমি সেসব কিছু বলছি না। বড়খোকা কিছুদিন আগে এসেছিল শুনলাম?' শিবনাথ জিজ্ঞাসা করে।

'ও হরি! এই কথা। তা এতে শোনার কি আছে? দরকার পড়েছিল তাই এসেছিল। কিন্তু সে তো অনেকদিন হয়ে গেল। তুমি বুঝি এতদিনে জানতে পারলে? তাহলেই বোঝো, এ সংসারের খোঁজখবর কত রাখো তুমি!' বনলতা আবার ফুট কাটে।

শিবনাথ এসব কথায় কান না দিয়ে বলে ওঠে, 'আর সবার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু তুমি? তুমি কি করে ও বাড়ি ভাড়া দেবার ব্যাপারে অনুমতি দিলে?'

বনলতা ঘাড় গোঁজ করে বলে, 'কি করতাম আমি? বাড়িসুদ্ধু সকলেই নাচছে, সবাই খাতায়-কলমে লিখে দিয়েছে কারও আপত্তি নেই, আমি একা না বললে কি হত। তাছাড়া যার নামে বাড়ি তারই তো উৎসাহ সব থেকে বেশি। দাদা মুখফসকে বলার আগেই পারলে লিখে দেয়। আবার এমনও নাকি বলেছে, দাদা প্রেস করলে সেখানে সে কাজ করতে যাবে।'

'আহা, পল্লবীর ওপর রাগ করে কি হবে? তুমি বুঝতে পারছ না, কেন ও এখনও ছেলেমানুষ, ও এসবের কি বোঝে? ওর কথার কি এমন দাম আছে?' শিবনাথ বিরক্ত গলায় বলে।

'খুব দায় আছে। মেয়ে কি আর সেই আগের মত আছে? সব সময় টকর-টকর করে কথা শোনাচ্ছে। দাদাদের হয়ে ওকালতি করছে। এমন একটা ভাব দেখায় যেন ওর দাদাদের এ বাড়ি ছেড়ে যাবার জন্য আমিই দায়ী।' বনলতা ঠোঁট ফোলায়।

শিবনাথ এবার অধৈর্যভাবে মাথা নাড়ে, 'তোমাকে নিয়ে আর পারি না বনো। একটা বাচ্চা মেয়ে যে নাকি পুরোপুরি সুস্থ নয়, তুমি তারও কথা ধরছ?'

'সুস্থ নয় মানে? তবে যে তোমরা বললে মেন্টাল হোম থেকে একেবারে সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছে? সেটা সত্যি নয়?' বনলতা চোখ ছোট করে।

'তা সত্যি হবে না কেন! একথা ঠিক পল্লবী আর আগের মত নেই। এখন অনেকটা ঠিক হয়ে গেছে। তবুও এটা তো মানবে, আর পাঁচটা স্বাভাবিক বুদ্ধির মানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলার মত ক্ষমতা ওর নাও থাকতে পারে।' শিবনাথ একটু হেসে তাকায় বনলতার দিকে, 'আমি কি বলছি বুঝতে পারছ?'

বনলতা বোকার মত মাথা নেড়ে না বলে।

'দ্যাখো, আজ ও লিখিত অনুমতি দিয়ে দিয়েছে দাদাকে ও-বাড়ি ভাড়া নেবার ব্যাপারে। ও সহজ সরল মানুষ। তোমার বড় ছেলেটিও নেহাতই ভালমানুষ। কিন্তু সে তো আর একা নয়, তার সঙ্গে অন্য একজন এখন জড়িয়ে আছে। সে যদি বুদ্ধি দিয়ে এরপর ও বাড়িটা কব্জা করতে চায় তুমি আটকাতে পারবে? যেহেতু বাড়িটা পল্লবীর নামে, ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে লিখিয়ে নিতে কতক্ষণ? প্রথমে ভাড়াটে হিসেবে ঢুকে পরে বাড়ির মালিক হয়ে ওঠা, এ আর এমনকি কঠিন? যেখানে পল্লবীর মত একটা নেহাতই গোবেচারা মানুষ জড়িয়ে?'

বনলতা হাঁ হয়ে শিবনাথের দিকে তাকিয়েছিল। ওর কথা বলা শেষ হলেও কথা বলতে পারছিল না। অনেকক্ষণ একইভাবে বসে থাকার পর হতাশ গলায় বলল, 'এখন কি হবে?'

শিবনাথ বুঝতে না পেরে বলে, 'কীসের কি হবে?'

'তুমি যা বললে এসব তো হতেই পারে। আমার মাথায় তো এত কিছু আসেনি। যতই সুস্থ হোক, ও মেয়ে যে আর পাঁচটা স্বাভাবিক মানুষের মত নয়, সেটা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। কি বলতে ওকে কি বুঝিয়েছে তার ঠিক আছে? বড়খোকাও তো আর আগের মত নেই। বউয়ের বুদ্ধিতে ওঠবোস করতে করতে একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে।' বনলতা একইরকম চিন্তিত সুরে বলে।

শিবনাথ এবার ঘাড় নাড়ে সজোরে, 'তবে আর কি বলছি, তখন থেকে তে তোমাকে এই কথাটাই বোঝাবার চেষ্টা করছি। তুমি বুঝলে তো! হতেই পারে বড়খোক এসে পল্লবীকে নানারকম গপ্পো শুনিয়েছে—প্রেস খুললে এই হবে, সেই হবে। ও মেয়েও তাতে ভুলে গেছে। আর এটাও সত্যি, মেন্টাল হোম থেকে ফিরে আসার পর তোমার মেয়ের জেদ আরও বেড়েছে। যতবারই ওকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিয়ের কথ বলতে গেছি, ও ঠিক বুঝতে পেরে উড়িয়ে দিয়েছে। বিয়ে নাকি ও এখন করবেই না পাত্রপক্ষের কাছে মিছিমিছি নিজেকে গ্র্যাজুয়েট বলে চালাতে পারবে না। আগে ও নিজে নিজে কিছু করবে।'

বনলতা অবাক হয়ে তাকায়, 'কি করবে ও নিজে নিজে?'